নিষ্পত্তি

হেমন্তনাথ ঘোষ

অগ্রণী বুক ক্লাব

প্রকাশক
প্রফুল্লকুমার রায়
অগ্রণী বুক ক্লাব
১৩, শিবনারায়ণ দাস লেন, কলিকাতা-৬

মুদ্রাকর
প্রফুল্লকুমার রায়
অগ্রণী প্রেস
১৩, শিবনারায়ণ দাস লেন, কলিকাতা-৬

প্রচ্ছদপট
বিশ্বনাথ দাস

ব্লক ও কভার
ভারত ফটোটাইপ ষ্টুডিও
৭২।১ কলেজ ষ্ট্রিট, কলিকাতা

প্রথম প্রকাশ
২ অক্টোবর, ১৯৫৫
পাঁচ টাকা

জ্যোতির্ময়ীকে

॥ ১ ॥

আদি কলকাতার আদি গলির মোড়ে ক্লাইভের আমলের দ্বিতল বাড়ি। কালের ধাক্কায় সরু সরু নগ্ন ইটগুলো নির্লজ্জভাবে নিরপরাধী পথিকদের দাঁত খিঁচোচ্ছে। তাদের অপরাধ, তাদের চোখে প্রশংসার প্রকাশ নেই, যেমন থাকতো বিগতদিনে নবীন মিত্তিরের আমলে। এ বাড়ির সেই মোহিনী রূপও নেই—সেদিনের সেই পথিকশ্রেণীও দুর্লভ। রয়েছে একটা নিষ্ফল আক্রোশ, নবাগতের ওপর একটা প্রচ্ছন্ন হিংসা, আর জোড়াতালি দিয়ে অস্তিত্বরক্ষার অক্ষম চেষ্টা।

সদর দরজার সামনে ছাইপাঁশের স্তূপ, তারি চারিপাশে শাল পাতা, কলপাতা, আঁশ, মাছেরকাঁটা, ছেঁড়ানেকড়া ইত্যাদি সাংসারিক অপ্রয়োজনীয় জিনিসের প্রদর্শনী। একটু তফাতে একটা নিঃস্ব ডাস্টবিন হাঁ করে সেদিকে তাকিয়ে।

সদর দরজার পেছনে অন্ধকার গলি—বাড়ির ভেতরে যাবার রাস্তা; দু পাশে ভাঙা রোয়াক, আর একটি অদ্ভুত প্রাগৈতিহাসিক গন্ধ।

গলি পেরিয়ে চকমেলানো সাবেকী বাড়ির উঠোন: পূর্বে হয়তো যাত্রাগানে কিংবা বাইজীর নূপুরধ্বনিতে মুখরিত হতো। এখন কলতলার কাঁথা-কাপড় কাচার শব্দে প্রকম্পিত। সামনে ঠাকুর দালান: অর্থনৈতিক তাগিদে কাঠের পার্টিশন দিয়ে ছোট ছোট

কুঠরীতে পরিবর্তিত। দ্বিতলের বারান্দার রেলিংগুলো বিবর্ণ জীর্ণ, নূতন জোড়াতালির অসঙ্গতিতে পূর্ণ।

পূর্বদিকে বাড়ির মালিকদের বাসস্থান, বাকী তিন দিকে উপরে ও নিচে নানা পরিবারের বাস, অর্থের পরিবর্তে সাময়িক অধিকার। অধিকাংশই নিম্ন মধ্যবিত্ত, কেউ কেউ মধ্যবিত্ত ঘেঁষা।

মালিকরা চার সরিক। উপরে নিচে মিলে খানদশেক ঘর রান্নাঘর নিয়ে একটু স্বতন্ত্র ব্যবস্থা করা। অবশ্য বাসিন্দাদের সগোত্র হতে এখনো এদের আপত্তি প্রকাশ পায় দরজা জানালার পর্দার বহরে।

পর্দার অন্তরালে হয়তো মুমূর্ষু আভিজাত্যের মরণ কাতরানি ঢাকা পড়ে।

চার সরিকের মধ্যে দু সরিক, মেজ এবং সেজ বিদেশে থাকেন। মেজ শিবকালী মিত্র মেদিনীপুরে জামাতা হিসাবে প্রাপ্ত সম্পত্তি ভোগ করেন; অবস্থা বর্তমান কষ্টিপাথরে ধনী না হলেও উচ্চমধ্যবিত্ত বলা চলে। সেজ জ্ঞানেন্দ্রপ্রসাদ মিত্র, পুরুষানুক্রমিক ছন্দ ভেঙে বাণিজ্যে লক্ষ্মীলাভ করার চেষ্টায় বিভিন্ন জায়গায় ঘুরে বেড়ান,—কখনো বোম্বাই, কখনো দিল্লী, কখনো কলকাতা। পুরাতন ছন্দের প্রতি অনুরাগ না থাকলেও যুগছন্দের মর্ম তিনি ভালই বোঝেন।

এ বাড়িতে বাস করেন বড় ও ছোট। বড়কর্তা রামকালী মিত্র: সাবেকী মানসিকতার ছিটেফোঁটা তাঁর মধ্যে পাওয়া যায়। এখনো তাঁর চরিত্রে একটু অহংকার মিশ্রিত উদারতা, একটু খোসামোদ-প্রিয়তা, একটু ভোজন-বিলাস এবং সংগীত, শিল্প ও সাহিত্যের প্রতি অনুরাগ লক্ষণীয়। ছোটকর্তা ব্রজেন্দ্রনাথ মিত্র: মানসিক গঠনে শুধু সাবেকী অহংকারের অধিকারী,—তবে সে অহংকারের বহিঃপ্রকাশ অতিবিনয়ের আবরণে নব রূপে রূপায়িত। তিনি অসাধারণ

প্রচণ্ড জয়োল্লাস করে উঠলো বিজয়ী দল।

নেতার দিকে চোখ পড়তেই ক্লান্ত মুখগুলো ভয়ে শুকিয়ে গেল। ইতিমধ্যে তাদের চেঁচামেচিতে আরো গুটিতিনেক ছেলেমেয়ে এসে জুটলো ব্যারিকেডের ধারে। তাদের মুখেও আশংকার ঘন কালিমা ফুটে উঠেছে। একটি ছোট মেয়ে তার ফ্রকের ফিতেটা খুলে নেতার হাতে দিয়ে বললে, মিনটুদা এটা দিয়ে তাড়াতাড়ি বেঁধে নাও। রক্ত যে বড্ড পড়ে গেল!

নেতা তথা মিনটুর তখন সেদিকে খেয়াল নেই। সে ভাবছে বাড়িতে কি কৈফিয়ত দেবে, সেই কথাই। তাকে ফিতেটা না নিতে দেখে মেয়েটি নিজেই ক্ষতস্থানটা বেঁধে দেবার জন্য এগিয়ে গেল। একটি ছেলে তার হাত থেকে ফিতেটা নিয়ে বললে, দে, দে, তুই বাঁধতে পারবি না, আমায় দে?

ফিতেটা কপালে জড়াতে জড়াতে ছেলেটি বললে, কি করে বাড়ি যাবি মিনটু? কাকা কিন্তু ভয়ানক মারবে।

কথাটা শুনে মিনটু একবার অসহায় দৃষ্টিতে চারদিক তাকালো। তারপর মিনতিভরা গলায় মেয়েটিকে বললে, রুনু, লুকিয়ে দেখে আসবি, বাবা কোথায়?

তার কথায় মেয়েটি ঝাঁজিয়ে বললে, এখন রুনু দেখে আসবি! কেন? বীর পুরুষ মারামারি করার সময় মনে থাকে না? যাও আমি পারবো না।—একটা মুখভঙ্গী করে রুনু চলে গেল।

তার গতির দিকে চেয়ে নিশ্চিন্ত হল মিনটু। সে অন্য একটি ছেলেকে লক্ষ্য করে বললে, আমার ত এখন বাড়ি যেতে হবেভাই, মাথাটা বড় ব্যথা করছে। কিন্তু.....

তার কথার ইঙ্গিত বুঝতে পেরে অমি বললে, সে আমি বইলুম। তোর ভয় নেই। ওরা আর আসছে না এদিকে।

দেখে নেব শুয়োরদের। ওরা আসুক না এবার।—কতকগুলো

॥ ৪ ॥

মিত্তিরবাড়ির বৈঠকখানা : গ্রীষ্মের দিনে দিবানিদ্রার পক্ষে যে ঘরটা বড়কর্তা রামকালী মিত্রের অতি প্রিয় এবং তাঁর পুত্র অমিয়কান্তি ওরফে অমি, ও ভ্রাতুষ্পুত্রী সুমিত্রা ওরফে রুনুর অতি অপ্রিয় ; দুই পাশে দুইজন দিবানিদ্রাবিরোধীকে নিয়ে সেখানে রামকালীবাবু শায়িত ; বয়স পশ্চিমে হেলেছে ; চেহারার মধ্যে রাগ কেদারার গাম্ভীর্য ; পোক্তা বাঁধনে লম্বা চেহারা. সুকান্তি বললে আপত্তি হবে না। কণ্ঠস্বরে তাঁর আসল বৈশিষ্ট্য,—খাদপঞ্চমে বাঁধা গুরুগম্ভীর নাদ আখ্যা দেওয়া যেতে পারে ; কথা বলার সময় শেষের দিকটা গভীর গমকে অর্দ্ধ-সমাপ্ত বলে মনে হয়। ছেলেরা তাঁর চেয়ে তাঁর কণ্ঠস্বরকে ভয় করে বেশি।

নিদ্রাজড়িত কণ্ঠে দুধারে দুজনের গায়ে হাত চাপিয়ে তিনি বললেন, কি রে তোরা ঘুমোলি ?

এতক্ষণ যদিও দুজনেরই চোখ কড়িকাঠ গণনায় ব্যস্ত ছিলো, রামকালীবাবুর প্রশ্নের পরেই তা নিদ্রায় মুদিত আছে বলে মনে না হওয়ার কোন কারণ রইল না। তিনি কিছুক্ষণ উত্তরের অপেক্ষায় কাটিয়ে দুজনের গায়ে হাত বোলাতে বোলাতে নিদ্রিত হয়ে পড়লেন।

বন্ধ দরজার গোড়ায় টিক্‌টিকির আওয়াজের অনুকরণে টাক্‌রার শব্দ হতেই অমি চঞ্চল হয়ে পড়লো ; সে চারিদিক ভাল করে দেখে বিড়ালের মত নিঃশব্দে দরজা খুলে বেরিয়ে গেলো। জানা না থাকলে ভেবে নেওয়া খুবই সোজা যে মেজেতে রবারের ম্যাটিং করা ! অমির পর রুনুও এই একই দক্ষতার পরিচয় দিলে।

অমি চাপা গলায় রুনুকে বল্‌লে, তুইও বেরিয়ে এলি কেন ?

বলে উঠলো, অমি, আজ কুলের যাত্রা ভাল রে! মাঝিগুলো সব ঘুমোচ্ছে।

অমি বললে দুহাতে তালি বাজিয়ে, জয় মা কালী, চল্ ওই পাটের নৌকোটায় বাঁধা ছোট ডিঙ্গিটা নিয়ে স'রে পড়ি! কথার শেষের তারা দুজনে খালের পাড় বেয়ে নামতে শুরু করে দিলে। ধারের পাটাতনের ওপর দিয়ে বড় পাটের নৌকোটায় উঠে তারা উঁকি মেরে দেখে নিলে ভেতরটা, তারপর বাঁদরের মত ঝুলে পড়লো ছোট ডিঙ্গিটার ওপর। অতি সন্তর্পণে দড়ি খুলে, বাঁশের লগিটায় একটা ঠেলা দিয়ে মিনটু বললে, মাঝিগুলো খুব ঘুমোচ্ছে, আজ অনেকটা ঘুরে আসা যাবে!

অমি বললে উৎসাহিত কণ্ঠে, আজ গঙ্গার দিকে চল্, পোলের গোড়া থেকেই ফিরে আসবো। পকেট থেকে আমের আচার বার করে দু-টুকরো নিজের মুখে পুরে দু-টুকরো মিনটুর মুখে ঢুকিয়ে দিলে। মুখের মধ্যে আমের আচার পেয়ে মিনটু ফুর্তিতে জোর জোর লগির ঠেলা দিতে লাগলো। তর তর করে তাদের ছোট ডিঙ্গিটা ভেসে চললো খালের মুখের দিকে।

অমি বললে, জানিস মিনটু বিজয় সিংহের গল্প? বাবা বলেন, তিনি নাকি সাত সমুদ্র তের নদী পার হয়ে লঙ্কায় রাবণের দেশে চলে গেছলেন! তখন তো ষ্টিমার ছিলো না নৌকায় করে তাঁকে যেতে হয়েছিলো!

আমের টকে মুখটা বিকৃত করে বললে মিনটু, তা আবার জানি না! বিজয়সিংহ বাঙালী ছিলেন, লঙ্কা জয় করে নাম রেখেছিলেন সিংহল।

অমি মাথা নেড়ে জানালে সেও একথা জানে।

আর একজন কে ছিলেন বল তো পৃথিবী ঘুরেছিলো? প্রশ্ন করলো অমি মিনটুকে ঠকাবার জন্য।

শাস্ত্রের বিধান যা এতদিন চলে আসছে তা মন্দ হলে কি চলতো ?

শাস্ত্রের দোহাই শুনে রামকালীবাবুর হাসি পেলো ; শাস্ত্র সম্বন্ধে ব্রজেন্দ্রনাথের জ্ঞান রামকালীবাবুর অজানা নয় : মুখে যাই বলুক শাস্ত্রের চেয়ে তার নিজের তাগিদ বেশি। কাজেই কথা না বাড়িয়ে বললেন তিনি, তোমার মেয়ে তুমি বিয়ে দেবে তাতে আমাদের কিছু আপত্তি থাকতে পারে না অবশ্য, পাত্র স্থির করেছ ?

হ্যাঁ প্রায় একরকম ঠিক করে এনেছি, ওই যে হরেকেষ্ট বোসের নাতি, নিতাইয়ের ছেলে ননী ! এবারে ফাষ্ট কেলাসে উঠলো—ওরা এই মাসের মধ্যে ছেলের বিয়ে দিতে চায় !

চমকে উঠে ক্রুদ্ধভাবে বললেন রামকালীবাবু, ওই বিশ্ববকাটে নিতার ছেলেটার সঙ্গে তুমি রুনুর বিয়ে দিতে চাও !

কি করবো বলো, অন্য পাত্র যোগাড় করতে গেলে এখুনি অনেক টাকা লাগবে !

এখানে টাকা লাগবে না ?

হরেকেষ্টবাবু বলেছেন আমাদের বাড়ির মেয়ে হলে, কোন কিছু দাবী নেই !

এতক্ষণে শাস্ত্রের নিগূঢ় অর্থ পরিষ্কার হয়ে গেলো রামকালীবাবুর কাছে। তিনি ক্ষুব্ধভাবে বললেন, পয়সা বাঁচাতে গিয়ে তুমি তোমার একমাত্র সন্তানকে বলি দেবে এ আমার ধারণার বাইরে—ভাল না হোক মাঝামাঝি পাত্র দেখে দেওয়ার সঙ্গতি তোমার আছে !

এতে মানুষের হাত কতটুকু ? ভাল দেখে দিলেও মন্দ হয়ে যায়, আবার মন্দ পাত্রও ভাল হয় !

এরপর কোন কিছু বলার ভাষা খুঁজে পেলেন না রামকালীবাবু, তাঁর চোখে ভেসে উঠলো কনিষ্ঠের গোটা চরিত্র : ধন সঞ্চয়ের মোহে নিজের পরিবারকে পর্যন্ত অর্ধভুক্ত রাখা ; দারিদ্র্যের অভিনয় ! এ স্বভাব ব্রজেন্দ্রনাথ কোথা থেকে পেলো ? তাঁর মনে হলো এ

॥ ৬ ॥

রাত্রির কাল যবনিকা সরে যাচ্ছে; মিত্তির বাড়ির ঘুলঘুলি, ফাটলের মধ্যে চড়ুই কেলেগোলার কাকলি সবে শুরু হয়েছে; সেই আলো-আঁধারের মধ্যে নিঃশব্দ সাবধানী পদক্ষেপে কারা যেন ঘুরে বেড়াচ্ছে বাড়িটার চারিপাশে।

বাড়ির সম্মুখদিকে ঘন ঘন বাঁশী বেজে উঠলো; বিছানা থেকে একলাফে বেরিয়ে গেলো মিনটু। শব্দ পেয়ে মৃণ্ময়ী দেবী বললেন উচ্চকণ্ঠে, কি রে মিনটু এতো সকালে কোথায় যাচ্ছিস্!

মিনটু ততক্ষণে নিচের তলায় নেমে গেছে।

বাঁশীর শব্দ লক্ষ্য করে মিনটু উর্ধ্বশ্বাসে সদর দরজা দিয়ে বেরোতেই একজন দারোগা তাকে চেপে ধরলেন। ভ্যাবাচেকা খেয়ে মিনটু তার মুখের দিকে চেয়ে হাত ছাড়াবার চেষ্টা করতে করতে বললে, ছেড়ে দাও আমাকে! দেখে নেবো শুয়োরদের!

দারোগার মুখে এক অদ্ভুত হাসি ফুটে উঠলো, তার মানেটা,—আমার চোখে ধুলো দিয়ে পালাবে কোথায় বাছাধন, আমি বলে এই ঘরে পেকে গেলুম! তিনি মিনটুকে একটা ঝাকুনি দিয়ে বললেন, কি নাম তোমার, এই খোকা!

জানি না, আমায় ছেড়ে দিন নয়তো আমি চেঁচাবো! বললে সে।

দারোগা বিরক্ত হয়ে একটু জোরে চেপে ধরে বললেন, পাজি ছেলে বলো কি নাম?

অমিতাভ রায়! ছেড়ে দিন এইবার! মিনটু বললে অগ্নি দৃষ্টিতে দারোগার দিকে তাকিয়ে।

তার কথার উত্তর না দিয়ে দারোগা ডাকলেন, হাবিলদার।

সেলাম করে এসে দাঁড়ালো হাবিলদার।

তার বড় বড় গোঁফ গালপাট্টা দেখে, দুর্গাঠাকুরের অসুরটার মত মনে হলো মিনটুর ; সে ভয় পেয়ে মিট্ মিট্ করে চাইতে লাগলো।

দারোগা বললেন, সাক্ষী মিলা ?

হ্যাঁ সাব, ওহি ঘড়িওয়ালা বাবু !

ইতিমধ্যে নিতাইচন্দ্র এসে দাঁড়িয়েছে।

তাকে জিজ্ঞেস করলেন দারোগা, আপনার নাম ?

আজ্ঞে নিতাইচন্দ্র চন্দ ! ভয়ে ভয়ে বললে সে।

আপনাকে আমাদের এই খানাতল্লাসীর সাক্ষী থাকতে হবে ! নিতাই একটু ইতঃস্তত করছে দেখে দারোগা তার দিকে কটমটিয়ে চাইতেই সে ঢোঁক গিলে বললে, কি করতে হবে হুজুর ?

খুশি হয়ে বললেন তিনি, সে পরে বলে দেবো।

নিতাইকে দেখে মিনটুর সাহস বেড়ে গেলো, সে বললে চেঁচিয়ে, দেখো তো নিতাই'দা এই লোকটা আমাকে শুধু শুধু ধরে রেখেছে !

নিতাই হাত কচ্‌লাতে কচ্‌লাতে বললে দারোগাকে, আজ্ঞে একে কেন ?

তুমি চেন নাকি ?

আজ্ঞে হ্যাঁ হুজুর, ওই ওপরতলার হারাধনবাবুর ছেলে।

এর সঙ্গে সুজিৎ ঘোষের কোন সম্বন্ধ নেই তুমি জানো ?

না হুজুর, কোনদিন একে সুজিৎ ঘোষের কাছে দেখিনি।

হুম্, দারোগা গম্ভীরভাবে ভাবতে লাগলেন নিতাইকে সন্দেহ করার কোন কারণ আছে কি না।

এদিকে দারুণ দুঃশ্চিন্তায় মিনটুর মুখখানা কালো হয়ে গেছে, এতক্ষণ আটকা পড়ে গেলো সে, হয়তো ললিতকে কিম্বা ভুতোকে, ওপাড়ার কেউ মারতে এসেছে, কিম্বা এতক্ষণ মারই খেয়ে গেলো ! জাম্বুবানের মত লোকটা তাকে যে কিছুতেই ছাড়ছে না !

সামনে একটা ইতিহাসের বই খোলা ; মিনটু শূন্য দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে বাইরের দিকে। মৃণ্ময়ীদেবী ছোট খুকীর জন্যে ফ্রক্ সেলাই করছেন বসে ; হঠাৎ তাঁর চোখ মিনটুর ওপর পড়তেই বললেন, এই বুঝি তোর পড়া হচ্ছে ?

মিনটু চম্‌কে খোলা পাতার দিকে চেয়ে পড়তে আরম্ভ করলো, সিপাই বিদ্রোহের পর মহারানী ভিক্টোরিয়া নিজ হস্তে ভারত শাসনের ভার লইলেন, তাঁহার সুশাসনে লোকে সুখে শান্তিতে বাস করিতে লাগিল...সেই সময় হই...তে...ই।

মিনটুর পড়া বন্ধ হয়ে গেলো সে ছটফট করে উঠে পড়লো।

কিরে উঠে পড়লি যে ? বললেন মৃণ্ময়ীদেবী।

এই যে আসছি ! বলে মিনটু বাইরে বেরিয়ে গিয়ে রাস্তায় দাঁড়ালো।

সেখানে দাঁড়িয়ে দেখলে—কোন লোকজন নেই ! সকালে এমন একটা ঘটনা ঘটে গেলো,—মাষ্টারনী বললেন আমাদের জন্যে উনি জেলে গেলেন ! কিন্তু কই ? সকলেই অন্য দিনের মত যে যার কাজে ব্যস্ত ! ওই তো রামকালীবাবু গড়গড়া টানছেন ; ফিটফাট মনোহরবাবু টেরি বাগাচ্ছেন ; নিবারণ জানা কি নিয়ে যেন বৌয়ের সঙ্গে ঝগড়া করছেন ; সুজিৎবাবুকে যে ধরে নিয়ে গেলো সে সম্বন্ধে তো কারুরি খেয়াল নেই ! তবে কি মাষ্টারনী মিথ্যে বললেন ?...সে চাইল সুজিৎবাবুর ঘরের দিকে। দেখলে অমির কাকা ব্রজেন্দ্রবাবু আর ললিতের বাবা ব্রজবিহারী কি যেন বলাবলি করছে দাঁড়িয়ে। সে কান খাড়া করে শুনতে চেষ্টা করলে। ব্রজেন্দ্রনাথের গলা ক্রমেই সপ্তমে উঠেছে—তার কানে এলো—কোথাকার বাউণ্ডুলে ছোকরা এসে জুটলো আমাদের বাড়িতে, তাও যাবি যা ঘরের চাবিটা খুলে রেখে গেলেই তো হতো, এখন দেখোত গেরো ! তালা বন্ধ পড়ে থাকবে ভাড়াও পাওয়া যাবে না। ওর মনে যেটুকু সন্দেহ ছিল

কেন ভক্তিমার্গের ওপর এত অশ্রদ্ধা কেন তোমার ? বললেন ব্রজেন্দ্রনাথ তাঁর স্বাভাবিক হাসি হেসে।

অশ্রদ্ধা নয় হে ! আমি দেখছি, যতই তুমি কৃষ্ণপ্রেমে মজছো ততই তোমার সাংসারিক প্রেম কর্পূর হয়ে যাচ্ছে ! তা ছাড়া কাপড় কোপনীতে দাঁড়াচ্ছে আর কামিনী না হক কাঞ্চনপ্রীতিতে প্রসিদ্ধ হচ্ছো !

গলাটা একটু পরিষ্কার করে নিয়ে বললেন ব্রজেন্দ্রনাথ, কি করবো দাদা, সামান্য আয়, তাতেই সংসার চালাতে হয়, তোমার কি বল ? অভাব তো নেই !

হেসে শিবকালীবাবু বললেন, আহা বিনয়ের অবতার ! এই একটা গুণ অবশ্য পেয়েছ বৈষ্ণবী আখড়ায়।

দেখ মেজদা, ভগবত প্রেম নিয়ে ঠাট্টা করা ভাল নয় !

তোমরা যে কুরুক্ষেত্রের শ্রীকৃষ্ণের কথা ভুলে যাও তাতেই তো গোল বাধে !

ভুল্‌বো কেন ? তবে গোপালই আমাদের আরাধ্য !

যাই বলো ওই নেড়ানেড়ী হিন্দু দেশকে ডোবালে।

ভুল কথা, যদি আমাদের কেউ রক্ষা করে থাকে তবে সে ওই বৈষ্ণব-ধর্ম, নয়তো বর্ণাশ্রমের জুলুমে কোনদিন সবাই মোছলমান হয়ে যেত। নিতাইয়ের প্রেমেই তরে গেলো বাংলাদেশ !

শিবকালীবাবু রামকালীবাবুর দিকে চেয়ে বললেন, দেখছো দাদা শাক্তকুলের প্রহ্লাদ।

আলোচনাটা ঘুরিয়ে দেবার মানসে বললেন রামকালীবাবু, রুনুর বিয়ের কি হবে তাই বল !

এ বিয়ে হতেই পারে না। গম্ভীরভাবে বললেন শিবকালীবাবু। থতমত খেয়ে ভয়ে ভয়ে বললেন ব্রজেন্দ্রনাথ, কেন কেন ?

যদিও ভ্রাতাদের মধ্যে কোন আর্থিক অধীনতা নেই তবু, বড়লোক

মেজকর্তাকে অসন্তুষ্ট করা ব্রজেন্দ্রনাথের পক্ষে শক্ত। মেজকর্তার সোজা আপত্তি শুনে তিনি রীতিমত ঘাবড়ে গেলেন।

আবার আরম্ভ করলেন শিবকালীবাবু, ব্রজ! দিনে দিনে সত্যিই তুমি অদ্ভুত হয়ে যাচ্ছ! এইটুকু মেয়ে, তাতে আবার ভাল বর, বর নয়। একটা তো মেয়ে, দেখে শুনে পরে ভাল পাত্র দেখে বিয়ে দিও।

অসহায় দৃষ্টিতে তাকালেন ব্রজেন্দ্রনাথ, একবার বড়কর্তা একবার মেজকর্তার দিকে; কথাটা যেন তাঁরও মেনে নিতে ইচ্ছে হচ্ছে। কিন্তু ভাল পাত্রের জন্যে ভাল টাকারও প্রয়োজন, মনে পড়তে তিনি চঞ্চল হয়ে বলে উঠলেন, সবই প্রভুর ইচ্ছা মেজদা, এতে মানুষের হাত কতটুকু! রুনুমার কপালে যদি দুঃখ থাকে, কে খণ্ডাবে বলো?

এমনসময় ঘরে এসে ঢুকলেন জ্ঞানেন্দ্রপ্রসাদ: বড় ভাইদের তুলনায় চেহারায় লালিত্যের অভাব থাক্‌লেও সেটা খুব চোখে পড়ে না; জার্মেনী কায়দায় চুল ছাঁটা, দাড়ি গোঁফ পরিষ্কারভাবে কামানো, চক্‌চকে দর্শনধারী; সাদা ট্রাউজারের ওপর ডেসিং গাউন চাপানো, মুখে আধহাতখানেক চুরুট।

তিনি এসে তক্তপোশের এককোণে পা ঝুলিয়ে বসে বললেন রামকালীবাবুকে লক্ষ্য করে, দেখ দাদা চেয়ার দু-চারখানা এনে রাখো, নয়তো বড় অসুবিধা হয়।

একটু লজ্জিত হয়ে বললেন রামকালীবাবু, হ্যাঁ হ্যাঁ, বড় ভুল হয়ে গেছে, আজই আনিয়ে নিচ্ছি।

হেসে বললেন শিবকালীবাবু, তুমি যে দিনে দিনে সায়েব বনে যাচ্ছ তা দাদা জানবে কি করে; তোমার অগ্রগতিটা খেয়াল রেখো!

জ্ঞানেন্দ্রপ্রসাদ বললেন চুরুটে একটা টান দিয়ে, তার চেয়ে বলো তোমরা যে পেছিয়ে যাচ্ছ সেই খেয়ালটাই আমার নেই। তোমাদের

অবাস্তব হয়ে গেছে, যা একদিন জীবনের মতই সত্য মনে হতো! মনে পড়ে যায় সুষমার স্বাস্থ্যপ্রাচুর্যের কথা, সেটা শুধুমাত্র কুৎসিৎ অস্থি-সমষ্টি হয়ে দাঁড়িয়েছে! কেন এ-রকম হলো? জীবনকে ফাঁকি দেবার ইচ্ছা তো তাঁর কোনদিনই ছিলো না? পড়া শেষ করে বাবার মৃত্যুর পর কত রকম ভাবেই না একটা ভাল চাকরীর সন্ধান করেছেন, শেষে না পেয়ে করছেন দালালী, সারাদিন হাড়ভাঙ্গা পরিশ্রম করেও সাংসারিক প্রয়োজন মেটানো ক্রমে অসম্ভব হয়ে উঠছে, তার ওপর মেয়ের বিয়ের খরচ! আর ভাবতে পারলেন না তিনি, ছট্‌ফট্‌ করে ঘরের মধ্যে পায়চারি শুরু করলেন।

হঠাৎ তাঁর মনে হলো. সুষমাই বুঝি সব কিছুর মূলে! ব্যর্থ জীবনের যত অভিমান যত আক্রোশ গিয়ে পড়লো তাঁর ওপর। অর্থহীন কাঠিন্যে তিনি গিয়ে দাঁড়ালেন সুষমার বিছানার কাছে। কি একটা রূঢ় কথা উচ্চারণ করতে গিয়ে চোখে পড়ে গেল সুষমার রোগপাণ্ডুর মুখখানা. আর সদ্যজাত শিশুর মত অসহায় দৃষ্টি! একটা ঢোক গিলে বললেন. অষুধ ফুরিয়ে গেছে আগে বলোনি কেন? শুধু শুধু রোগটা বাড়িয়ে লাভ কি!

একটা ক্ষীণ হাসি ফুটে উঠলো সুষমার মুখে, মনে হলো স্বামীর অন্তরের গোপনতম স্তর পর্যন্ত দেখে নিয়েছেন। বললেন, আমার জন্যে ভাবনা নেই তাড়াতাড়ি মরলেই ভাল, খুকীটার জন্যেই ভাবনা ওর জ্বরটা যে আবার বেড়ে উঠলো!

ব্রজবিহারীবাবু স্ত্রীর রুক্ষ চুলগুলোয় হাত বোলাতে বোলাতে বললেন, সুরেশ ডাক্তারকে খবর দি, অষুধটা দিলেই জ্বরটা নেবে যাবে।

বাবা ভাত দেওয়া হয়েছে, ঘরে এসে ঢুকলো মালতী: দোহারা গড়ন, রং উজ্জ্বল শ্যামবর্ণ, নিপুণ শিল্পীর হাতে খোদাই করা মুখশ্রী, সরু তুলিতে আঁকা ভুরুর তলায় টানা টানা ঘন কালো চোখ।

সে তো ঠিক কথা, বাড়িতে অসুখের জন্যে বড় টানাটানিতে পড়েছি, আপনাকে এই হপ্তার মধ্যেই একমাসের ভাড়া শোধ দিয়ে দেবো !

বেশ এই হপ্তার মধ্যেই দিও। ব্রজেন্দ্রনাথ পাশের ঘরে ভাড়া আদায় করতে গেলেন ; ব্রজবিহারীবাবু কাজে বেরোলেন।

হাতে ডাক্তারী ব্যাগ নিয়ে সুশ্রী, ফিট্‌ফাট্‌ একটি স্যুট্‌পরা যুবক এসে কড়া নাড়লো। ভেতরে সুষমার কণ্ঠস্বর শোনা গেলো, মালতী দেখতো মা, কে যেন কড়া নাড়ছে !

মালতী খাওয়া সেরে হাত ধুচ্ছিলো ; সে কাপড়ে হাত মুছে, গায়ের কাপড়টা গুছিয়ে নিয়ে এসে দরজা খুলে দিলে।

ভেতরে এসে সুরেশ বললে, মাসীমা আছেন কি রকম মালতী ? তারপর তার মুখের দিকে চেয়ে বললে একটু হেসে, মুখ-ময় হলুদ যে ? খুব রান্না করা যাহোক !

মালতী লজ্জিত হয়ে মাথা নিচু করলে ; দুজনে গিয়ে ঢুকলো সুষমার ঘরে।

বিছানার কাছে দাঁড়িয়ে হাতটা তুলে নাড়ী দেখতে দেখতে সুরেশ বললে, এদিকে এসেছিলুম তাই একবার আপনাকে দেখতে ঢুকে পড়লুম, কেমন আছেন ?

সুষমা শুয়ে শুয়েই মাথার কাপড়টা ঠিক করে নিয়ে বললেন নিম্নস্বরে, আমার জন্যে ভেব না বাবা, খুকীটার জ্বর আবার বেড়েছে, ওকে একটু দেখ।

তা নয় দেখছি—কিন্তু আপনার শরীর তো তেমন ভাল নেই মনে হচ্ছে ; অষুধটা খাচ্ছেন তো ?

অষুধ আজ তিন দিন ফুরিয়ে গেছে আর আনা হয়নি একথা বলতে বাধলো সুষমার, শুধু মাথা নাড়লেন।

সুরেশ ছোট খুকীর বুকে স্টেথিস্‌কোপ বসিয়ে পরীক্ষা করলে।

সুরেশ চায়ের কাপ নিয়ে, একটা চুমুক দিয়ে বললে, বাঃ সুন্দর হয়েছে আর রংটাও ঠিক তোমার গালের মতন।

মা শুনতে পাবে, আপনি ভারী অসভ্য।

মালতীর মনের মধ্যে সুখের বান এলো : বুঝি বা দুকুল ভাসিয়ে দেয়। সুরেশের দিকে চেয়ে ভাবে, এর ওপর নির্ভর করা চলে, তবে কেন সে দ্বিধাভরে সরে যাবে!

সুরেশ চায়ে চুমুক দিতে দিতে চেয়ে থাকে মালতীর দিকে : পাথরের গড়া একটা নিখুঁৎ মূর্তি, শিল্পীর সামনে বুঝি প্রাণপ্রতিষ্ঠার অপেক্ষায় দাঁড়িয়ে!

হাতের মধ্যে কতকগুলো টুকরো ডালপালা, বইখাতা নিয়ে ঘরে এসে ঢুকলো ললিত। দেখতে দিদির মতন; শাড়ী পরিয়ে দিলে বেছে নেওয়া শক্ত কে ললিত।

সুরেশকে দেখে বললে সে, এই যে ডাক্তারবাবু কখন এলেন?

এই খানিকক্ষণ হলো। তারপর ললিতের হাতের দিকে লক্ষ্য করে বললে, ওগুলো কি হে? ডালপালা দিয়ে কবরেজি অষুধ বানাবে নাকি?

একটু হেসে চাইল ললিত; তারপর একটা ফ্যাকড়াওয়ালা ডাল তার মুখের সামনে ঝুলিয়ে বললে, ম্যাজিক ডাক্তারবাবু! দেখবেন?

কই দেখি।

মালতী বললে, এই রে ললিতের পাল্লায় পড়েছেন? ডালের ম্যাজিক দেখতে শুরু করলে আপনার বাড়ি ফেরা মুশকিল হবে।

সুরেশ মুচকি হেসে চাইল মালতীর দিকে।

দিদির কথায় কান না দিয়ে ভাঙ্গা একটা ডাল তুলে ধরে বললে ললিত, এই দেখুন! কি দেখছেন?

কিছু না ভাঙ্গা ডাল। সুরেশ বললে ছদ্ম গাম্ভীর্যে।

ভাল করে দেখুন! একটা হরিণ ছুটে যাচ্ছে!

রুন্তু মায়ের কথায় কান না দিয়ে বসলো গিয়ে সাবিত্রী দেবীর কোল ঘেঁষে। তিনি তার গায়ে হাত দিয়ে বললেন, ছি মা, তোমার বিয়ে হবে কাল, আজ কি বাইরে বেরোতে আছে?

বারে, বিয়ে হবে বলে ঘরের মধ্যে বসে থাকবো নাকি?—ভারি তো বিয়ে! ক্ষুব্ধ ভাবে বললে রুন্তু।

তার কথায় সবাই হেসে উঠলো।

ও, বিয়ের কি বোঝো বাপু! বলে গেলেন বড়গিন্নি—চল রুন্তু ব্যসন দিয়ে তোর হাত-পায়ের ময়লাগুলো তুলে দিগে, রুন্তুকে নিয়ে তিনি বেরিয়ে গেলেন।

ললিতা পিসিমার ঠাট্টায় গিন্নিদের আসর থেকে উঠে এসে ঢুকলো নিজের ঘরে। সৌখীন জ্ঞানেন্দ্রপ্রসাদের আধুনিক রুচি অনুযায়ী খরিদ করা কতকগুলো আস্‌বাবে সাজানো ঘরটি। একটা সোফায় বসে পড়ে ললিতা সেল্‌ফ থেকে বই টেনে পড়তে চেষ্টা করলো। মনটা তার কেমন যেন হয়ে গেছে পিসিমার কথায়। পিসিমা যেন কি? এত বয়স হয়েছে তবু মুখে কিছু আটকায় না! তাকে না হয় বালিস বুকে করে শুয়ে থাকতেই দেখেছে তাই বলে সবায়ের সামনে ওইভাবে বলা কি তাঁর উচিত হয়েছে? সে ছটফট করে বই বন্ধ করে উঠে পড়লো।

আরশির কাছে দাঁড়িয়ে চুলগুলো ঠিক করে নিয়ে বেরিয়ে গেলো ঘর থেকে। ছাতের সিঁড়িতে উঠতে উঠতে তার মনে হলো ক'লকাতায় সে যেন হাঁপিয়ে উঠেছে! ভাল লাগে না। ছাতে উঠে আল্‌সেতে ভর দিয়ে চারিদিকে চাইল, দেখলে বাড়ির পেছন দিকে হিন্দুস্থানী গাড়োয়ানগুলো কাজের থেকে ফিরে যে যার রুটি পাকাচ্ছে; সেদিক থেকে চোখ ফিরিয়ে নিলে। সূর্য অস্তমিত, শুধু সোনালি

রশ্মিরাশি তখনও চল্‌তি মেঘের কোলে দোল খাচ্ছে ; সেইদিকে চেয়ে বিমনা হয়ে পড়লো।

কতক্ষণ কেটে গেছে খেয়াল নেই, হঠাৎ মনে হলো তারদিকে কে যেন চেয়ে রয়েছে। ঘাড় ফিরিয়ে নিচের দিকে চাইতেই দেখতে পেলে, তাদেরই ভাড়াটে মনোহর ছেলেটা চেয়ে। অসহ্য লাগলো ললিতার ; আচ্ছা অসভ্য তো ছেলেটা, ওরকম করে চেয়ে থাকার মানে কি ?

ফিরে চাইতেই ললিতা দেখতে পেলে ছাতের অপরপ্রান্তে কে যেন গঙ্গার দিকে মুখ করে দাঁড়িয়ে। পেছন থেকে তার চেনা মনে হলো : মিনটু না ? হ্যাঁ তাইতো ! সে পায়চারি করতে করতে এগিয়ে গেলো সেই দিকে। প্রায় দেড় বছর হলো সে মিনটুকে দেখেনি, মিনটু অনেক বড় হয়ে গেছে। ভাবতে ভাবতে ললিতা মিনটুর কাঁধের ওপর একটা হাত রাখলে। চম্‌কে চাইলো মিনটু, তারপর তাকে দেখে হেসে বললে, ললিতাদি, আমি ভাবছিলুম কে না কে !

কি করছো মিনটু চলো দুজনে বেড়াই। —তার কাঁধে আর একটা হাত চাপিয়ে সপ্রশংস দৃষ্টিতে তাকালো ললিতা তার মুখের দিকে। মিনটুও চাইল : অনেকদিন পরে সে দেখছে ললিতাকে, তার মনে হলো কি যেন বদ্‌লে গেছে,—ঠোঁটটা যেন বেশি লাল রং, আগের চেয়ে অনেক ফরসা দেখাচ্ছে, আর ভুরুগুলো তো এতো সুন্দর ছিলো না ! গড়েরমাঠে দেখা মেমেদের মত ঠেক্‌লো মিনটুর।

তাকে আল্‌তো আকর্ষণ করে বললে ললিতা, চলো আমরা ছাতে পায়চারি করি। মিনটুর একটা হাত চেপে ধরে ছাতের একপ্রান্ত থেকে আর একপ্রান্ত পর্যন্ত বেড়াতে শুরু করলে ললিতা।

অন্ধকার গাঢ় হয়ে আবার ফ্যাকাশে হচ্ছে। কৃষ্ণপক্ষের

মধ্যে লুকিয়ে ফুঁপিয়ে উঠলো সে, তাকে কাছে টেনে সান্ত্বনার সুরে বললে ললিতা, ছিঃ কাঁদতে নেই ! নিজেকে সংযত করার নিস্ফল চেষ্টায় ফুলে ফুলে উঠলো মিনটু। তাকে জড়িয়ে ধরে গায়ে হাত বোলাতে লাগলো ললিতা। মিনটু তার মুখটা ললিতার বুকে চেপে ধরে যেন কতকটা শান্ত হলো। আকাশের টুকরো মেঘগুলো থেকে তখন ফোঁটা ফোঁটা জল পড়তে শুরু করেছে। ললিতা তার মুখটা দু-হাতে তুলে ধরে বললে, নেবে চলো মিনটু বৃষ্টি এলো।

॥ ১ ॥

কৈশরের সীমান্তে এসে অমিতাভ, মানে মিনটু, হয়ে উঠেছে স্বল্পভাষী, কল্পনাপ্রবণ ও আদর্শবাদী।

বয়সের তুলনায় তার এই পরিবর্তন অনেকেরই চোখে অস্বাভাবিক ঠেকছে। এমন কি মৃণ্ময়ী দেবীও স্বামীকে এ সম্বন্ধে সজাগ করার চেষ্টা করেছিলেন এই বলে, মিনটু যেন আজকাল কি রকম হয়ে যাচ্ছে, প্রায়ই কোন কথা বলে না গুম হয়ে বসে থাকে, তা ছাড়া খেলাধুলা তো একেবারে ছেড়ে দিয়েছে! ছেলেটার দিকে একটু লক্ষ্য রাখো।

উত্তরে তিনি বলেন, ওটা কিছু নয়, বয়স বাড়ার মুখে তাই।

অমিয়কান্তি মানে, অমি, সেদিন প্রায় রাগ করেই বললে, দেখ মিনটু তুই আর আমাদের ভালবাসিস না আগের মত! তুই যেন কি রকম হয়ে যাচ্ছিস!

কোন উত্তর না দিয়ে মিনটু চুপ করে ছিল। তার মনে হয়েছিলো অমির কি ছেলে মানুষের মত খেলা, খেলা! তার চেয়ে অনেক বড় কাজ, আনন্দের কাজ, করার সুযোগ সে পেয়েছে। বলা নিষেধ নয়তো সে অমিকে বুঝিয়ে বলে দিতো।

দিনে দিনে সুজাতা দেবীর খুব প্রিয়পাত্র হয়ে উঠেছে অমিতাভ —আজকাল প্রায়ই সে সুজাতাদির ফরমাস মাফিক নানা কাজ নিয়ে ঘুরে বেড়ায় কলকাতার অলিতে গলিতে। কাজেই খেলাধুলার সময় কই? সুজাতাদি তাকে বিশ্বাস করেন এই গর্বে তার মন ভরে ওঠে। ডকের থেকে গোপনে যে সব জিনিস আজকাল নিয়ে এসে দেয় সুজাতাদিকে সে সব জানলে, তার বয়সের ছেলেরা তো ভয়েই মরে যাবে, ভাবে অমিতাভ।

গভীর রাত্রে এক একদিন সে আর সুজাতাদি যখন বাড়ি থেকে চুপি চুপি বেরিয়ে যায় কোন কাজে, পায়জামা, কোট আর পাগড়ী বাঁধা সুজাতাদির পাশে পাশে সে যখন হেঁটে চলে, জনমানবহীন নিদ্রিত ক'লকাতার রাস্তার রাস্তায়, তখন তার কি যে ভাল লাগে, সে কথা সে কি করে বুঝাবে অমিকে! তার ইচ্ছে হয় অমিকেও এই কাজে সঙ্গে নিতে, কিন্তু সুজাতাদির নিষেধ; তিনি বলেন এখনও সময় হয়নি। দিনের পর দিন এ কাজ তাকে নেশার মত পেয়ে বসেছে; ভবিষ্যতের কত ছবিই না সে কল্পনায় দেখতে পায়।

নিজের ঘরটার মধ্যে টেবিলের সামনে বই নিয়ে বসে অমিতাভ, বার বার তাকাচ্ছে সুজাতা দেবীর দরজার দিকে একটা অতিপরিচিত ইঙ্গিতের আশায়। আজ কদিন হলো সে সুজাতাদির ডাক পায়নি! তার মনে হচ্ছে হয় সে অজান্তে কোন অপরাধ করে ফেলেছে, নয় সুজাতাদির কোন বিপদ ঘটেছে!

হারাধনবাবু বাজার করতে বেরিয়ে যেতেই, সে উঠে পড়লো পড়া ছেড়ে। ঘর থেকে বেরিয়ে সুজাতাদির দরজার গোড়ায় গেল। দরজাটায় তালা লাগানো দেখে তার মনটা ছ্যাঁৎ করে উঠলো—তবে কি এ-কদিন সুজাতাদি ফেরেন নি? আর তো সে বসে থাকতে পারে না! সুজাতাদির খবর আজ তাকে যোগাড় করতেই হবে। তার জানা যতগুলো আড্ডা আছে সবগুলো খোঁজ করে আসবে। সম্ভব অসম্ভব নানা কথা ভাবতে ভাবতে সে সদর দরজা ছেড়ে রাস্তায় গিয়ে পড়লো।

প্রথম স্থানটিতে যেতেই তার সঙ্গে দেখা হলো অমলদার। তিনি ইসারায় তাকে ডেকে নিয়ে গিয়ে দাঁড়ালেন গলির মোড়ে। চারদিক চেয়ে চুপিচুপি বললেন, এখানে আর এসো না, পুলিশে নজর রেখেছে—আর কোথাও না গিয়ে বাড়ি যাও। ব্যাকুল ভাবে বললে

অমিতাভ, সুজাতাদি ? তাঁর সঙ্গে আমার যে একবার দেখা করতেই হবে !

তাঁর সঙ্গে এখন দেখা হওয়া অসম্ভব, তাঁকে গোপনে থাকতে হবে !

কতদিন পরে দেখা হবে অমলদা ?

কি করে বলবো ! তুমি এখন যাও অমিতাভ, সাবধানে থাকবে। তাকে ঠেলা দিয়ে বললেন তিনি।

টলতে টলতে অমিতাভ এগিয়ে গেলো বড় রাস্তা দিয়ে। সামনে পার্কের মধ্যে ঢুকে একটা বেঞ্চিতে বসে পড়লো সে।

ছায়াচিত্রের মত কতকগুলো ছবি তার চোখের সামনে স্পষ্ট হয়ে উঠতে লাগলো। সুজাতাদি যদি ধরা পড়েন, যদি সুজিতবাবুর মত দ্বীপান্তর হয়। যদি ফাঁসি হয় ! আর ভাবতে পারলো না সে, ছটফট করে উঠে বেরিয়ে গেল পার্ক থেকে। সব যেন তার কাছে নিরর্থক হয়ে যাচ্ছে, কে তাকে দেশসেবার সুযোগ করে দেবে ? কে তাকে উপদেশ দেবে ? কে তাকে বলে দেবে কোন পথে যাবে।

হঠাৎ সুন্দর ব্যাণ্ডের শব্দ কানে এলো। জনতার ভেতরে ভেতরে গলে এসে দাঁড়ালো বড় রাস্তার মোড়ে। নিজের চোখকে বিশ্বাস করতে পারছে না। বাঙ্গালীপল্টনের মত তারই বয়সের কত ছেলে পা মিলিয়ে চলেছে। কংগ্রেস-পতাকা নিয়ে ঘোড়ায় চেপে চলেছে, সাইকেলে চলেছে, মাঝে মাঝে চিৎকার উঠছে, বন্দেমাতরম, স্বাধীন ভারত কী জয়, পণ্ডিত মতিলাল নেহরুকি জয় !

মনে পড়ে গেল, কাগজে পড়েছে, ভারতের জাতীয় কংগ্রেসের অধিবেশন আজ ক'লকাতায় শুরু হবে। উত্তেজনায় সে দুরু দুরু কাঁপতে লাগলো। এতো লোক দেশকে ভালবাসে ! শুধু সুজাতাদি নয় !

॥ ৬ ॥

বৈঠকখানায় রামকালীবাবুর সঙ্গে ব্রজেন্দ্রনাথের আলোচনা চলেছে।

রামকালীবাবু বেশ উত্তেজিত, খাদপঞ্চমে তিনি বলে চলেছেন, দেখ ব্রজেন তোমাকে আমি প্রথমেই বলেছিলুম মেয়েটার বিয়ে অন্তত ঘরটা দেখে দাও, তা তুমি কান দিলে না।

সবই গোপালের হাতে। আমরা কতটুকু করতে পারি। দার্শনিক আমেজে বললেন ব্রজেন্দ্রনাথ।

ও সব কথা রাখো, আজই গিয়ে নিয়ে আসতে হবে রুনুকে।

দাদা এখনও ভেবে দেখ। ইহকাল তো গেল মেয়েটার, পরকালের কিছু কাজ করুক শ্বশুর শাশুড়ীর সেবা করে।

রামকালীবাবুর মুখের চেহারা কঠিন হয়ে উঠলো, কড়াভাবে বললেন তিনি, চুলোয় যাক্ পরকাল। আমি বলছি রুনুকে নিয়ে আসতেই হবে, নয়তো আমি আজই শিবু, জ্ঞানকে সব কথা জানিয়ে চিঠি লিখবো।

নির্লিপ্তভাবে ব্রজেন্দ্রনাথ বললেন, যা পারো কর তোমরা, আমার আর ভাল লাগছে না, আমি এরপর বৃন্দাবন কিংবা পুরীতে গিয়ে কিছুদিন বাস করবো, প্রভুর সেবায় যদি সব ভুলতে পারি।

রামকালীবাবু তাঁর দিক থেকে মুখ ঘুরিয়ে নিলেন: ব্রজেন্দ্রনাথের কথাগুলো আজ যেন অতি-অভিনয়ের পর্যায়ে গিয়ে ঠেকেছে। তাঁর চোখে ভেসে উঠলো ব্রজেন্দ্রনাথের জীবনচিত্র: অতি তুচ্ছ ব্যাপারে মাঝে মাঝে অতি কুৎসিৎ স্বার্থসচেতনতা।

ব্রজেন্দ্রনাথের বৃন্দাবন-যাত্রা তিনি শুনে আসছেন গত দশবৎসর যাবৎ। সংসারের শেকড় উপড়ে আসা-তো দূরের কথা, ভিৎ ফুঁড়ে প্রবেশ করার চেষ্টায় সেটাতে ফাটল ধরতে বসেছে।

মৃণ্ময়ী দেবী সুরেশ ডাক্তারের কাছে গিয়ে নিম্নস্বরে জিজ্ঞেস করলেন, কেমন মনে হচ্ছে ?

হাতের ইসারায় জানিয়ে দিলে কোন আশা নেই। খাটের পাশে গিয়ে তিনি কপালে হাত দিলেন সুষমার। সুষমার চোখ খুলে গেল, ঠোঁটের কোণে একটু হাসি টেনে বললেন খুব ধীরে, দিদি এসেছো ? তোমার সামনেই কাজটা সেরেনি, হয়তো আর সময় হবে না। মানে না বুঝে সবাই চেয়ে রইল তার দিকে। সুষমা হাতের ইসারায় ডাকলেন সুরেশকে : তারপর দম নিয়ে বললেন, অনেকদিন তোমায় বলবো করে বলা হয়নি—মালতীর ভার তুমি নাও বাবা।

জড়িত কণ্ঠে বললে সুরেশ, তার জন্যে কি—সে সব হবে এখন।

অপলক দৃষ্টিতে সুরেশের মুখের দিকে চেয়ে বললেন সুষমা, কথা দাও বাবা।

ইতস্তত করছে দেখে মৃণ্ময়ী দেবী তারদিকে তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে তাকালেন, সুরেশ একটা ঢোক গিলে বলে ফেললে, কথা দিলুম মাসিমা।

আমি নিশ্চিন্তে মরতে পারবো, ভগবান তোমার ভাল করবেন বাবা। আরামে চোখ বুজলেন সুষমা একবার, তারপর হাত বাড়িয়ে মালতীর একটা হাত নিয়ে সুরেশের কম্পিত হাতের ওপর রাখলেন, মালতীর ক্লান্ত চোখদুটো সুরেশের মুখের ওপর পড়লো, সুরেশের মুখখানা তখন যেন অতিমাত্রায় লাল হয়ে উঠেছে।

সুষমার ক্ষীণ দেহটা একবার জোরে দুলে উঠলো। মৃণ্ময়ী দেবী জিজ্ঞেস করলেন, কষ্ট হচ্ছে সুষমা ?

না দিদি শুধু যেন হাওয়া নেই মনে হচ্ছে। হাঁপাতে হাঁপাতে বললেন সুষমা। ক্রমে তাঁর হাঁপানি বেড়ে উঠলো, একটু হাওয়ার জন্যে কি আকুলতা। জল থেকে তোলা মাছের মত হা করেও বুঝি হওয়া মেলে না।

মৃণ্ময়ী দেবী বললেন সুরেশের দিকে চেয়ে, এ কষ্টের কি উপশম হয় না ?

অক্সিজেন দিতে পারলে কতকটা হতো কিন্তু। নিদারুণ ছটফট করে সুষমা বলে উঠলেন, ওঁকে ডেকে দাও। ওঁকে ডেকে দাও। মালতী গিয়ে ব্রজবিহারীবাবুকে ডেকে আনলে।

স্বামীকে দেখে সুষমার ঠোঁট দুটো কেঁপে উঠলো, কোন কথা বেরোল না, শুধু গাল বেয়ে গড়িয়ে পড়লো দু ফোঁটা জল। প্রচণ্ড কাসিতে সমস্ত শরীরটা দুলে নেতিয়ে পড়লো; এক ঝলক রক্ত গড়ালো কশ বেয়ে, তারপর স্পন্দনহীন, অসাড়; শুধু তীক্ষ্ণ ছুরির মত একটুকরো বিদ্রূপের হাসি তখনও তাঁর ঠোঁটের কোণে লেগে আছে, অমিতাভর মনে হলো।

ক্রন্দনে ভেঙ্গে পড়লো মালতী আর ললিত। ব্রজবিহারীবাবু বেরিয়ে গেলেন ঘর থেকে।

মিত্তিরবাড়ির অন্য সমস্ত বাসিন্দারা এসে প্রচুর সহানুভূতি দেখালেন, কিন্তু শব নিয়ে যাওয়ার লোকের অভাব ঘটলো। একে অনাত্মীয়া তায় যক্ষ্মারোগী।

হারাধনবাবু অনেক কষ্টে পাড়া থেকে কয়েকজন যুবককে ধরে এনে দায় উদ্ধার করলেন।

হঠাৎ বাইরে সমবেত জনতার চিৎকারে ক্লাসের ছেলেরা চম্‌কে উঠলো।

কলেজের পাশের রাস্তা দিয়ে তখন হেঁকে চলেছে, বন্দে মাতরম্‌; স্বাধীন ভারত কি জয়; মহাত্মা গান্ধীকি জয়; প্রফেসরের সম্মতির অপেক্ষা না-রেখে হুড়মুড় করে সমস্ত ক্লাসের ছেলেরা বেরিয়ে গেল বারান্দায়। বারান্দার দিকে তাকিয়ে জনতা উত্তেজিত কণ্ঠে চিৎকার করলে, গোলামখানা বন্ধ হোক! গোলামি মন লুপ্ত হোক!

ছেলেরা ছটফট করে উঠলো, একটা অস্ফুট গুঞ্জনে ভরে উঠলো কলেজ সীমানা।

অমিতাভর মনে চাবুকের মত এসে পড়লো, গোলামখানা বন্ধ হোক! কলেজের চারিদিকে সে চাইলে। এই তো শুভ মুহূর্ত!

ক্লাস থেকে বই খাতা বগলে নিয়ে সে নিঃশব্দে বেরিয়ে গেল! কলেজের গেটের কাছে গিয়ে শেষবারের মত ফিরে তাকালো কলেজটার দিকে; একটা ব্যথার চিড়িক লাগলো মনে; সামলে নিয়ে সে এগিয়ে চললো।

কলেজ স্কোয়ারের ধারে সত্যাগ্রহী অফিসের সামনে এসে দেখলে, তার মত বহু ছেলে আগে এসে অপেক্ষা করে দাঁড়িয়ে। নাম লিখিয়ে নির্দেশ শুনে বাড়ি ফিরে আসতে অমিতাভর বেশ একটু দেরী হলো।

সামান্য একটু হিংসার আঁচ পেলেই অচল হয়ে যাবে আন্দোলন, সেরকম গণআন্দোলন অসম্ভব !

এ সম্বন্ধে গান্ধীজি ঠিকই করেন, কারণ সাধারণ-লোক নির্বোধের মত বাড়াবাড়ি করে বসলে, গান্ধীজি কেন কেউই তাদের ফেরাতে পারবে না !—জ্ঞানেন্দ্রপ্রসাদ বললেন জোর গলায় ।

বিরক্ত হয়ে বললেন ব্রজেন্দ্রনাথ, কেন বাজে কথা নিয়ে মাথা ঘামাচ্ছ, নেমন্তন্নের ফর্দটা সেরে ফেললে তার চেয়ে কাজ হবে ।

তাঁর কথায় কান না দিয়ে বললেন জ্ঞানেন্দ্রপ্রসাদ, দেখ মেজদা গান্ধীজির খদ্দরের বাতিকটা যদি না থাকতো তো ভাল হতো, দেশকে বড় করতে হলে যন্ত্রশিল্পের প্রয়োজন, চরকায় দেশের দুঃখু ঘুচবে না ।

শিবকালীবাবু দার্শনিক ভঙ্গীতে বক্তৃতার সুরে বললেন, ওটার মধ্যে যে কতবড় মঙ্গলময় সত্য লুকিয়ে আছে তা তুমি বুঝবে না জ্ঞান, তুমি তোমার ব্যবসা বুদ্ধি দিয়েই দেখছো !

যথা ?—একটু ঠাট্টার সুরে বললেন জ্ঞানেন্দ্রপ্রসাদ ।

সমগ্র জগতের শান্তির ও মুক্তির জন্যে অমূল্য ভারতীয় ভাবধারা ওর মধ্যে প্রত্যক্ষ সত্য রূপে নিহিত রয়েছে, তোমাদের পাশ্চাত্য বিলাসী মন ও অর্থ বুঝবে না !

ভারত স্বাধীন হলে ও তত্ত্বকথা কেউ মনে রাখবে ভাব ? গান্ধীজির বড় চেলারাই তখন যন্ত্র-আমদানির কাজে উঠে পড়ে লাগবেন । স্বাধীনতা বড় প্রশ্ন,তাই আজ ওপ্রশ্ন ধামাচাপা পড়েছে !

হতাশভাবে একটা নিঃশ্বাস ছেড়ে বললেন শিবকালীবাবু, ওই তো, ওইখানেই আমরা ভুল করি—গান্ধীজিকে বুঝতে হলে তাঁর সমস্ত জড়িয়ে বুঝতে হবে নয়তো তাঁর কাজেরও হদিস পাব না, সিদ্ধিলাভও সম্ভব নয় !

পকেট থেকে একটা সিগারেট বার করে ধরিয়ে জ্ঞানেন্দ্রপ্রসাদ বললেন, থাক ! তর্ক রেখে এখন একটা কাজের কথা জিগ্যেস করি,

জামাইকে একটা মোটর কিনে দিতে হবে কোন মেকারের দি বলতো?

ব্রজেন্দ্রনাথ বললেন একটু আরাম পেয়ে, ভাল অবস্থায় একটা সেকেণ্ড হ্যাণ্ড গাড়ী কিনলেই তো হয় মিছিমিছি নতুন গাড়াই—

তোমার যেমন বুদ্ধি ব্রজ। একে ছেলে সরকারী চাকুরে তায় সৌখীন, নূতন গাড়ী না দিলে মন উঠবে কেন?

হ্যাঁ হ্যাঁ একটা ভাল গাড়ীই কিনে দাও—বললেন রামকালীবাবু তাড়াতাড়ি।

শিবকালীবাবু দাদার হাত থেকে গড়গড়ার নলটা নিয়ে টানতে লাগলেন। কিছুক্ষণের জন্যে ঘরটা নিস্তব্ধ হলো।

বেলা প্রায় একটা হয়ে গেছে, তবু কর্তাদের ওঠবার লক্ষণ না দেখে চাকর মারফৎ বড়গিন্নির পরোয়ানা হাজির হলো; সবাই সসব্যস্ত হয়ে পড়লেন।

ঘরে এসে ঢুকলো ললিত। তার হাতে একটা কাগজের মোড়ক। তাকে দেখে ব্রজেন্দ্রনাথ বললেন, কিরে ললিত ভাড়া এনেছিস্?

মোড়কটা সামনে রেখে বললে ললিত, এখন একমাসের নিন, বাকীটা পরে নেবেন।

রেগে বললেন ব্রজেন্দ্রনাথ, তার মানে?

ক মাসের ভাড়া বাকী আছে হে ব্রজবিহারীর? ব্রজেন্দ্রনাথের দিকে চেয়ে বললেন রামকালীবাবু।

তিন তিন মাসের। এ সব চালাকি চলবে না, বাবাকে বলবি ভাড়া দিতে না পারলে উঠে যেতে। বললেন ব্রজেন্দ্রনাথ কড়াভাবে। ললিত মাথা নিচু করে দাঁড়াল।

ললিতের মুখের দিকে চেয়ে রামকালীবাবু বললেন নরমগলায়, ললিত, বাবাকে বলো অন্তত দুমাসের একসঙ্গে দিতে, আমাদেরও খরচাপাতি আছে এমাসে।

মানে, কাজটা করতেই হবে। বাবাকে আমি নিজেই বলতে পারবো।

আমি পারবো না! জোর দিয়ে বললে সে।

ঝগড়া হয়ে যাবে অমি!

হোক!

দুজনেই গোঁ হয়ে বসে রইল। শেষে অমিয়কান্তিই প্রথমে কথা বললে, আচ্ছা আচ্ছা, সে হবে। কবে যেতে হবে তোকে কাঁথি?

দু একদিনের মধ্যেই, এখনও ঠিক হয়নি।

অমিয়কান্তি মাথাটা ঘুরিয়ে নিয়ে চুপ করলে।

তোর ইচ্ছে করে না অমি আন্দোলনে যোগ দিতে? জিজ্ঞেস করলে অমিতাভ তার দিকে চেয়ে; কোন উত্তর না পেয়ে তাকে ঠেলা মেরে আবার বললে, কিরে কথা বলছিস না যে?

ইচ্ছে করে কিন্তু কলেজ ছাড়তে আমার আপত্তি, ওটা পারবো না।

তা পারবি কেন? সব ব্যাপারই স্বাভাবিক থাকা চাই তা সত্ত্বেও যদি স্বাধীনতা পাওয়া যায় আপত্তি নেই কেমন?

তাই কি আমি বলছি, ভারীগলায় বললে সে।

ঘরের মধ্যেটা থমথমে হয়ে উঠেছে; দু-জনেই চুপচাপ, দু-জোড়া চোখ পরস্পরের মুখের ওপর দৃষ্টির-জ্যোতি ফেলে ফেলে সরে যাচ্ছে।

দুজনেই হাঁপ ছেড়ে বাঁচলো যখন ঘরে এসে ঢুকলেন হারাধনবাবু।

ধীর শান্ত-গতিতে তিনি এসে একটা চেয়ারে বসলেন: কপালে চিন্তার রেখা, যোদ্ধার মত কঠিন মুখেও অন্তর্দ্বন্দ্ব পরিস্ফুট। স্বাভাবিক ভাবেই বলতে চেষ্টা করলেন তিনি, মিনটু আমি এক পরিচিত বন্ধুর কাছে শুনলুম তুমি কলেজ ছেড়ে সত্যাগ্রহীদলে যোগ দিয়েছ।

পেশীগুলো টক্‌টকে লাল আর কঠিন হয়ে উঠেছে। তাড়াতাড়ি সে চোখ ফিরিয়ে নিয়ে উঠানে নেমে পড়লো।

উঠানের মাঝখানে এসে দেখলে, মিত্তিরদের জানালার গরাদে ধরে রুনু দাঁড়িয়ে আষাঢ়ের ঘন কাজল মেঘের মতই ঢলঢলে বর্ষনোন্মুখ চোখ দুটো। নিজের চোখ টিপে বন্ধ করে এগিয়ে গেল অমিতাভ—'ওঃ অসহ্য! বাড়ি থেকে বেরোতে পারলেই যেন বাঁচে।

মিত্তির বাড়ির বাসিন্দারা অমিতাভর পেছনে পেছনে সদর দরজা পর্যন্ত গেল; রাস্তায় নামতেই কে যেন চেঁচিয়ে উঠলো, বন্দেমাতরম্।

মিত্তিরদের জীর্ণ বাড়িটা কাঁপিয়ে বহুকণ্ঠে প্রতিধ্বনি উঠলো, বন্দেমাতরম্।

অমিতাভ ফিরে তাকিয়ে দেখলে, দাঁত খিঁচনো বাড়িটা যেন হাসছে—আর পেছনের গাড়োয়ানগুলো এসে দাঁড়িয়েছে বিস্মিত চোখে।

গলিটা পেরোতেই ছুটতে ছুটতে অমিয়কান্তি তার সঙ্গ নিলে; সে বললে হাঁপাতে হাঁপাতে, চল তোকে পৌঁছে দিয়ে আসি।

কলেজ স্কোয়ারে পৌঁছোতে অমিতাভ দেখলে কাঁথি যাত্রী সত্যাগ্রহীরা সব নিচে জমা হয়ে গেছে; তার দেরি হয়ে গেছে, সে তাড়াতাড়ি অমিয়কান্তির কাছে বিদায় নেবার জন্য হাত বাড়ালে; অমিয়কান্তি হাতদুটো চেপে ধরলে।

চিঠি দিস মিনটু! সে বললে কম্পিত কণ্ঠে।

দেবো, মাকে দেখিস ভাই! মিনতির সুরে বললে অমিতাভ।

তার দিকে না চেয়েই, মাথাটা নিচু করে বললে অমিয়কান্তি, দেখবো। তারপর হন হন করে ফিরে গেল।

অমিতাভ অন্য কুড়িজন সত্যাগ্রহীর সঙ্গে মিলিত হবার পর একজন নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি তাদের প্রয়োজনীয় উপদেশ দিলেন—তাঁর মূল কথা হচ্ছে, সর্বক্ষেত্রেই অহিংস থাকতে হবে, গুলীর সামনে, লাঠির

॥ ১ ॥

কণ্টাই রোড স্টেশন। রাত্রির-অন্ধকার বিদায় নিচ্ছে; বেগুনে আলোয় আশ্চর্য দেখাচ্ছে লাল কাঁকড় বিছানো ছোট স্টেশনটি।

জনহীন, নিস্তব্ধ; তেলের বাতিগুলো তখনও জ্বলছে।

আকাশে বেগুনে আলো, মিটমিটে বাতি, টেলিগ্রাফের ক্ষীণ ধাতব শব্দ, সবগুলো জড়িয়ে অনন্য অনুভূতি অমিতাভর মনে।

সত্যাগ্রহীরা ট্রেন থেকে নামবার পর নেতার কণ্ঠে ধ্বনি উঠলো বন্দেমাতরম্। প্রতিধ্বনি হলো কুড়িটা কণ্ঠে।

সাড়া পড়ে গেল স্টেশনে। স্টেশনমাষ্টার বেরিয়ে এলেন; তাঁর হাতের গোল আলোটা তখনও জ্বলছে। অন্য কর্মচারীরা এসে ছড়িয়ে দাঁড়ালো, সাধারণলোকরা এসে ঘিরে নিলে সত্যাগ্রহীদের।

তারা কোন কথা জিজ্ঞেস করবার পুর্বেই একজন বললেন, আপনারা কাঁথি যাবেন তো? রাস্তায় ওই-যে বাসগুলো দাঁড়িয়ে আছে, ওতেই আপনাদের যেতে হবে।

তাঁকে একটা নমস্কার ক'রে আদেশ দিলেন নেতা, আগে বাড়ো!

দুটো সারি এগিয়ে চললো।

রাস্তায় বাসচালকদের মধ্যে হুড়োহুড়ি পড়ে গেল কে নিয়ে যাবে; সবাই বলতে শুরু করেছে,—আমার জানা আছে আমি নিয়ে যাবো!

চালকদের মধ্যে কোন আপোসের সম্ভাবনা না দেখে আদেশ দিলেন নেতা, আমাকে অনুসরণ কর!

ভিড় ঠেলে নেতার পেছনে পেছনে সমগ্র দলটি উঠলো সামনে দাঁড়ানো একটি বাসের মধ্যে।

তখন বেশ ফরসা হয়ে এসেছে। দু'পাশে বিসর্পিত কাটা ধানজমি

॥ ২ ॥

কেন্দ্রীয় সত্যাগ্রহ শিবিরে, চব্বিশ ঘণ্টা থাকার পর অমিতাভদের প্রতি একটি লিখিত নির্দেশ এলো—সুধীর সেনের নেতৃত্বে তাদের চারজনকে বেলা চারটের সময় পিছাবনকেন্দ্রে রওনা হতে হবে। পথপ্রদর্শক একটি স্বেচ্ছাসেবক তাদের প্রয়োজন হলে সঙ্গে যেতে পারে। নিচে অধিনায়কের সই! সুনির্মল সকলের দিকে চেয়ে বললে, এখানে কাল শুনলাম পুলিসের রোখ পিছাবনী কেন্দ্রে সবচেয়ে বেশি।

ভালতো একেবারে সেরা কেন্দ্রে হাজির হবো। তোমার কি ভয় করছে সুনির্মল? বললে সুধীর তাকে ইঙ্গিৎ করে। না না ভয় নয়, আমাদের অভিজ্ঞতা নেই তাই ভাবছি। চল ভাই অভিজ্ঞতা হতে কতক্ষণ? তার পিঠে একটা চাপড় মেরে অমিতাভ বললে।

বিদেশে বিপদের মুখে বন্ধুত্ব জমে ভাল। এরাও চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে বেশ পরস্পরকে আপনার করে নিয়েছে।

বেলা চারটের সময় তাদের প্রস্তুত হবার আহ্বান এলো পথ-প্রদর্শক এসে দাঁড়ালো তাদের সামনে। রওনা হলো তারা চারজন।

কাঁথি শহরের মধ্যে দিয়ে বুক টান করে চললো ধ্বনি দিতে দিতে।

শহর ছেড়ে পিছাবনীর পথে হাঁটতে হাঁটতে তারা মাঝে মাঝে গাছের তলায় বসলো।

হাঁটায় অনভ্যস্ত সবাই তবু কেউ কারুর কাছে হার মানবে না এই পণ। যেতে যেতে সুখময়ের স্যাণ্ডেলের ফিতেটা গেল ছিড়ে; বিরক্ত হয়ে পায়ের থেকে খুলে ধুলোশুদ্ধ সেটা ব্যাগের মধ্যে ভরে নিতেই সবাই হেসে উঠলো।

॥ ৪ ॥

পিছাবনী কেন্দ্রে পনেরদিন কেটে গেল। অমিতাভর আর ভাল লাগছে না। কাজের মধ্যে শুধু নুন ফোটানো। এইজন্যেই কি সে এতদিন এতো কথা ভেবে রেখেছে! বীর অহিংস সৈনিক হবে, অত্যাচার উৎপীড়ন তুচ্ছ করে হাসি মুখে বিপদের সামনে দাঁড়াবে এই তো তার কাম্য—কিন্তু একি? শিবিরে বসে দিনের পর দিন নুন ফোটানো!

এরি মধ্যে সে বার দুয়েক ঈশ্বরদাকে অনুরোধ করেছে, তাকে কোন সক্রিয় কেন্দ্রে পাঠাবার জন্যে, যেখানে নুন তৈরি করা হয়। তিনি শুধু হেসে বলেছেন, হবে' হবে ব্যস্ত কেন?

আজকাল তার ক্রমে একটু একটু রাগ হতে আরম্ভ হয়েছে, ঈশ্বর-দার ওপর। তিনি তো লোক মন্দ নন, তবে কেন তার অবস্থাটা বুঝছেন না? শুধু কি সে, সুনির্মলও হাঁপিয়ে উঠেছে!

রাত্রি প্রায় নটা। মাদুরে শুয়ে-শুয়ে অমিতাভ চাইলে ছাউনির দিকে। সত্যাগ্রহীর দল এরি মধ্যে যে যার কম্বলের ওপর লম্বা লম্বা শুয়ে ঘুমিয়ে পড়েছে; তাদেয় ক্লান্ত মুখে সারাদিনের পরিশ্রমের ছাপ তখনও মিলোয়নি।

উঠে বসে অমিতাভ জানলা দিয়ে তাকালে; ওপারের পুলিশের শিবিরটাও নিঝুম, নিস্তব্ধ!

অন্ধকারে অজগরের নিঃশ্বাসের মত শব্দ ভেসে আসছে ওপাড় থেকে।

অমিতাভর মনে পড়ে গেল, এই সময় সবচেয়ে খুশিমনে গীতা পড়েন ঈশ্বরদা, ঠিক এই সময় ধরতে পারলে তার একটা ব্যবস্থা হয়ে যেতে পারে। পা টিপে সে উঠে দাঁড়ালো। তাকে উঠতে দেখে শুয়ে-শুয়েই সুনির্মল বললে, কি হলো? উঠলে যে?

সুনির্মল যে ঘুমোয়নি সেটা ধারণা ছিলো না তার ; সে বিরক্ত-ভাবেই বললে, হবে আবার কি, ঈশ্বরদাকে একটা কথা জানাতে হবে !

তড়াক করে একলাফে উঠে বললে, সুনির্মল, বুঝেছি ! আমিও যাবো ।

সুনির্মলের কম বয়সের অছিলায়—পাছে অনুমতি না পায় এই ভয়ে সঙ্কিত হয়ে উঠলো অমিতাভ । সে মুখ গোঁজ করে এগিয়ে গেল অফিস ঘরের দিকে ।

যেতে যেতে মিনতির সুরে বললে সুনির্মল, আমার জন্যেও একটু বলে দিও অমিতাভ, আমারও আর ভাল লাগছে না এখানে !

বলতে হয় নিজে বলো, আপনি পায় না শঙ্করাকে ডাক, রাগের সুরে বললে অমিতাভ ।

অফিস ঘরের চাঁচের ফাঁকে চোখ রেখে অমিতাভ একবার দেখে নিলে ঘরের ভেতরটা : ঈশ্বরদা রোজকার মত আজও আসন করে গীতা পড়ছেন ; চশমাটা প্রায় নাকের ডগায় ঝুলে পড়েছে । অমিতাভ একটা গলার আওয়াজ করে ঢুকে পড়লো ।

গীতার থেকে চোখ তুলে হেসে প্রশ্ন করলেন তিনি, কি হে খবর কি এখনও ঘুমোওনি !

অমিতাভর পেছনে সুনির্মলকেও ঢুকতে দেখে বিস্মিত হয়ে বললেন, আরে তুমিও যে ? মারামারি করেছ নাকি দুজনে ?

মাথাটা প্রচণ্ডভাবে চুলকোতে চুলকোতে বলে ফেললো অমিতাভ, আমাদের আর ভাল লাগছে না এখানে ! দুজনের দিকে সোজা তাকিয়ে গম্ভীর গলায় বললেন তিনি সত্যাগ্রহী হলে কেন ? বাড়িতে থাকলেই ত পারতে ?

তাঁর গলার স্বর ও চোখের দৃষ্টি দেখে দুজনেই ঘাবড়ে গেল ।

একটু থেমে অবার বললেন তিনি, বেশ কালই তোমাদের বাড়ি যাবার ব্যবস্থা করে দিচ্ছি ।

দুজন এখানে কাজ করবে,—ঈশ্বরদা কদিনের রিপোর্ট চেয়ে পাঠিয়েছেন।

সুধীরের চোয়ালের হাড়গুলো যেন আরো চোয়াড়ে হয়ে গেছে, কপালে একটা কাটা দাগ, রং হয়ে গেছে তামাটে। সুখময়, বিভূতি তাদেরও চেহারা বদলে গেছে।

অমিতাভ, সুনির্মলের দিকে চেয়ে আকর্ণ হেসে বললে সুধীর, এইতো চাই, দেখবো এইবার বীরত্ব।

এক পোঁটলা নুনমাটি দিয়ে সুধীর বললে পথপ্রদর্শককে, এটা জমা দিও, অনেক কষ্টে আজ বাঁচিয়েছি।

জিজ্ঞাসুনেত্রে সে চাইতেই বিভূতি বললে, পুলিশে উনুন ভেঙ্গে দেবার সময় সুধীরদা ওটা বুকের তলায় নিয়ে শুয়ে পড়েছিল, শ্রীবপুকে দুতিন জন পুলিশে মাটি ছাড়াতে না পেরে গোটা দুয়েক কোঁৎকা মেরে ছেড়ে দিলে। সবাই হেসে উঠলো সেই কথায়।

সুধীর রাগের ভান করে বললে, আমি এদিকে কোমর কন্‌-কনানিতে গেলুম আর ওঁরা হাসছেন, এসো তোমরা আমার সঙ্গে! হাসতে হাসতে সবাই তাকে অনুসরণ করলো।

॥ ৬ ॥

স্নান সেরে অমিতাভ এসে নিজেদের ডেরাটার দিকে ভাল করে চাইলে।

অনেকগুলো বাড়ির পেছনে ঝোপঝাড়ের মধ্যে চালাটা যেন উঁকি মারছে—কোথাও জনমনিস্যির চিহ্ন নেই।

সে সুধীরকে জিজ্ঞেস করলে, আচ্ছা সুধীরদা থাকবার জন্যে জঙ্গলের মধ্যে এই ঘরটাই বাছলে কেন?

কারণ প্রভুরা—অতিপরিচিত ভঙ্গী করলে সুধীর।

কিন্তু সুধীরদা নীতির দিক থেকে এটা কি ঠিক?

কার্যক্ষেত্রে একটু-আদটু নীতির পরিবর্তন হয়ে যায় ভাই।

কিন্তু গান্ধীজি যে চিঠি লিখে...

কথা শেষ করতে না দিয়ে, বলে চললো সুধীর, সেটা ব্যক্তিগত ক্ষেত্রে সম্ভব, গণ-আন্দোলনে সেটা সম্ভব নয়। সংগ্রাম শুরু করে শত্রুপক্ষকে পদ্ধতিগুলো জানিয়ে না দেওয়াই সংগ্রামের পক্ষে সুবিধা-জনক আজকাল সেই রকমই নির্দেশ আসছে—পরে হয়তো আরো গোপনতার প্রয়োজন হবে ভাই।

অমিতাভ চুপ করলে। মানিক এসে খবর দিলে ভাত দেওয়া হয়েছে। সবাইকে ডেকে সে চলে গেল।

লম্বা একটা সরু দাওয়ায় সারি সারি খাবার জায়গা করা। অমিতাভরা একে একে গিয়ে বসলো।

একটি একটি বাড়াভাতের থালা দিয়ে গেলেন একজন স্ত্রীলোক; দোহারা শ্যামবর্ণ চেহারা, সাধারণ মুখের ওপর মমতা মাখানো, শক্ত বাঁধন।

সুধীর বললে, অমিতাভের দিকে চেয়ে, আমাদের সোনাদি।

॥ ৮ ॥

মিত্তির বাড়ির ছাতের ওপর চলেছে বঙ্গীয়-ছাত্র-সমিতির তরফ থেকে একটি ঘরোয়া গোপন বৈঠক। আলোচনায় ঠিক হয়ে গেল গোপনতা বজায় রেখে তারা সক্রিয়ভাবে যোগ দেবে আইন অমান্য আন্দোলনে। তাদের প্রধান কাজগুলি হচ্ছে,—সত্যাগ্রহ সংগ্রাম চালাবার জন্যে অর্থ সংগ্রহ, সংগ্রামের সঠিক খবর প্রচার, বিলাতী-দ্রব্য-বর্জন আন্দোলনকে শক্তিশালী করে তোলা।

অমিয়কান্তি, ভূতো, ললিত এবং অন্যান্য গুটিকতক সহপাঠি আজ এই ঘরোয়া বৈঠকে হাজির। একটা-কর্মসূচী ঠিক হয়ে যাওয়াতে তারা বেশ উৎসাহিত।

আলোচনার শেষে ভূতো বললে, জানিস কাল আমি একটা চমৎকার ব্যাপার দেখেছি?

সমস্বরে সবাই বললে, কি?

কলেজ স্কোয়ারে সরবতের দোকানে একজন পকেট থেকে সিগারেট বার করে ধরাতেই তার পাশে অন্য যেসব লোক ছিলো তারা উঠে গেল—ভদ্রলোক লজ্জিত হয়ে সিগারেটটা ফেলে দিয়ে উঠে বেরিয়ে গেলেন। উৎফুল্লকণ্ঠে বললে ললিত।

সত্যি। সিগারেট বয়কট একদিনে হয়ে গেল, একি কম কথা, কাউকে বলতেও হয়নি।

হেসে বললে অমিয়কান্তি, আমার সাহেব কাকা দেখছি বিলাতী চুরুট ছেড়ে দিশি সরু চুরুট খেতে আরম্ভ করেছেন। সেদিন চাকরটা কি একটা বিলিতি জিনিস এনেছিলো বলে তাকে মারেন আর কি!

একজন বেঁটে খাটো ছেলে বলে উঠলো, আর এই তক্‌লি। বাসে, ট্রামে, রাস্তায়, ঘরে সবাইয়ের হাতেই ঘুরছে।

॥ ৯ ॥

একটু বেলা করে আজ অমিতাভ বেরোচ্ছিল ডেরাটার থেকে, গলির মোড়ে যেতেই সোনাদির ডাক শুনতে পেলে, আজ নাই-বা যেতে অমিতাভ।

সে ফিরে তাকালো। তিনি বললেন, কাল রাত্রে কিছু খাওনি, শরীরটাও খারাপ আজ বিশ্রাম করো হুন করা পালিয়ে যাবে না।

হেসে বললে সে। সকালে আমি ভালই আছি। কিছু হবে না, এখুনি ফিরে আসবো সোনাদি।

তাঁর মুখখানা ম্লান হয়ে এলো, অভিমানের সুরে বললেন, ভাল যে কেমন তা মুখ দেখেই মালুম হচ্ছে।

না না আপনি কিছু ভাববেন না—বলতে বলতে এগিয়ে গেলো সে।

যেতে যেতে সোনাদির কথাই ভাবতে লাগলো : অশিক্ষিতা গ্রাম্য স্ত্রীলোক যে পরের জন্যে এতখানি স্বার্থত্যাগ করতে পারে স্বচক্ষে না দেখলে অবিশ্বাস্য থেকে যেত। যত দিন যাচ্ছে এর মহত্ত্বের নব নব রূপ তার কাছে প্রকাশিত হয়ে পড়ছে। নিজের পক্ষাঘাতে পঙ্গু স্বামী ও অতি বৃদ্ধ শ্বশুরের সেবায় সমস্ত দিন ব্যস্ত থাকলেও, কোন দিনের জন্যে সত্যাগ্রহীদের সম্বন্ধে বিন্দুমাত্র অমনোযোগিতা সে লক্ষ্য করেনি। গ্রামের সমস্ত চাষী মিলে চাঁদা দিয়েই খালাস, তারপর সত্যাগ্রহীদের যা কিছু ব্যবস্থা সব সোনাদি। দিনের পর দিন বিনা দ্বিধায় অক্লান্ত পরিশ্রম করে চলেছেন, কেউ কোন দিন মুখে বিরক্তির আভাস পায়নি।

সুধীরদা সেদিন বলেছিলেন, কলকাতায় এ জিনিস সহজলভ্য নয়, দেখে নাও গল্প করতে পারবে। শহুরে সভ্যতায় মেকি বেশি, আছে মনের দৈন্য, নিস্ফল গর্ব, আর স্বার্থপরতা গোপন করার নানা চতুর চেষ্টা। স্ববারি সেখানে গুণের সামিল।

॥ ১০ ॥

জ্বরের ঘোরে পড়ে আছে অমিতাভ, সোনাদি বাতাস করে চলেছেন।

জড়তা মাখান চোখে সে চাইলে ; তার কপালে হাত বোলাতে বোলাতে বললেন সোনাদি,—এখন কেমন আছ ভাই ?

মুখে কোন উত্তর না এসে একটু ক্ষীণ হাসি ফুটে উঠলো ; সোনাদি বললেন,—বললুম বেরিয়ে কাজ নেই, তা তো শুনলে না। এখন দেখতো, গাটা জ্বরে পুড়ে যাচ্ছে।

মানিক এসে চুপিচুপি সোনাদিকে কি বললে ; সোনাদি তাড়াতাড়ি পাখাটা রেখে উঠে বেরিয়ে গেলেন।

অমিতাভর মাথায় অসহ্য যন্ত্রণা, সারা দেহে আগুন জ্বলছে। চোখের সামনে সব কিছুই হলদে হয়ে আসছে। সে পাশ ফিরে চোখ বুজলো ; তার মনে, মা, বাবা, রুনু, অমি, কত মুখ ছায়াচিত্রের মত আসছে আর মিলিয়ে যাচ্ছে মনে এলো ঢেউয়ের দোলা লাগা বয়াটা—এই মুহূর্তে সে যদি একবার যেতে পারতো! ভাবতে ভাবতে মনে হলো মা, বাবা, অমি, রুনু সবাই তাকে ঘিরে বসে আছে। আঃ!

এদিকে বাড়ির সামনে গলির মুখে চলেছে দারুন গোলমাল। গ্রামের অধিকাংশ চাষী এসে জুটেছে। দাওয়ায় বসা বৃদ্ধ মানিকের ঠাকুরদা হাত মুখ নেড়ে একজন দারোগাকে, কি যেন বোঝাতে চেষ্টা করছেন। দারোগা বলছে চড়া গলায়,—আমরা খবর পেয়েছি এইখানেই স্বদেশী ছেলেগুলো আড্ডা গেড়েছে। বল কোথায় তারা নয়তো তোমাদেরই ফল-ভোগ করতে হবে।

সেই সময় মানিক এসে ভিড়ের মধ্যে একজন চাষীকে কি যেন

॥ ১১ ॥

জাতীয় সংগ্রামের উচ্চতম গৌরবমুহূর্তে, কলকাতার জীবনস্পন্দন বিবর্দ্ধিত হয়ে চলেছে।

বাংলার একপ্রান্তে, সমুদ্রসৈকতে অহিংস সংগ্রামের চরম অগ্নি-পরীক্ষা, অপরপ্রান্তে, চট্টগ্রামের পর্বতমালার নিস্তব্ধ অটবী ভেদ করে স্বপ্নবিভোর কৈশোরের অনিরুদ্ধ বাসনার আত্মঘাতী বিস্ফোরণ।

গভীর রাত্রে, বাস্তব কলকাতার রূপান্তর ঘটেছে। বগলে একটা করে প্রচার পত্রের বাণ্ডিল নিয়ে অমিয়কান্তি, নির্মল বেরিয়ে গেল হোস্টেলের পাঁচিল টোপকে ; দারোয়ানটা তখন রোয়াকের ওপর পড়ে নাসিকার সাহায্যে শঙ্খধ্বনি করছে।

তাদের নির্দিষ্ট এলাকায় লোকের সংবাদপত্রের চাহিদা মিটিয়ে, কোথাও জানলা গলিয়ে ফেলে, কোথাও দেওয়ালে লটকে তারা ফিরলো। ক্লান্ত তড়িৎপদে হোস্টেলের পাঁচিল টপকাবার সময় অমিরকান্তি দেখতে পেল, চোরের মত একজন লোক যেন অন্ধকারে মিলিয়ে গেল। নিজেদের মধ্যে মুখ চাওয়াচায়ি করে চিন্তিতপদে উঠে গেল পূর্বের ঘরে।

পা ছড়িয়ে শুয়ে তক্তপোশটার ওপর কখন যে অমিয়কান্তি ঘুমিয়ে পড়েছে জানে না, একটি ছাত্রের ঠেলাঠেলিতে তার ঘুম ভাঙ্গলো। নিচু গলায় সে বললে, পুলিশে হোষ্টেল ঘেরাও করেছে!

বাইরের লোকের তো এখানে থাকার নিয়ম নেই, অমিয়কান্তি ঘাবড়ে বললে,

না। মেসিনটাকে আর তোমাকে দেখতে পেলেই সব ধরা পড়ে যাবে!

এখন উপায়?

বাংলার গোপনতম পল্লীস্রোতস্বিনীর ধারে দৈনিক হয়ে চলেছে, ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের স্ফুলিঙ্গ বিকাশ।

তুচ্ছ ঘটনার অন্তরালে বৃহত্তর সম্ভাবনা নিয়ে রোজকার মত আজও বসে সুধীর, অমিতাভ, বিভূতি, সুখময়, সুনির্মল।

সামান্য মাটির ঢিপির মধ্যে জীবনের মূল্যবান মর্মকথাকে মূর্তি দেবার মানসে যেন পাঁচটি জাটায়ু পক্ষ-বিস্তার-করে, ধীরে ধীরে স্ফুটনোন্মুখ তাদের অতি প্রিয় ভবিষ্যৎকে বলদর্পী রাবণের শ্যেন-দৃষ্টির আড়ালে লুকিয়ে রাখতে চায়।

শালারা একটা দিনও কি কামাই দেবে না! চাবুকের চোটে পিঠে দগ্‌দগে ঘা হয়ে গেল তবু তেলানি যায়নি, দাঁড়াও আজ দেখাচ্ছি! পাড়ে আগত দারোগা চিৎকার করে উঠলো।

বেতটা হাওয়ায় ঘোরাতে ঘোরাতে ছুটে নেবে এসে দারোগা অমিতাভর ফতুয়াটা একটা হেঁচকা টানে ছিঁড়ে ফেললে, তারপর আদেশ করলেন পুলিশদের, সব শালাকো কাপড়া ফাড়ো!

চমকে উঠলো সত্যাগ্রহীরা; অমিতাভর মুখেও কিসের যেন চাঞ্চল্য। নিজের শরীরটা আপ্রাণ-শক্তিতে গুটিয়ে সে দম ধরে পেটের কাপড়ের বাঁধনটা শক্ত করে নিলে। পুলিশবাহিনীর চললো ধস্তাধস্তি।

দুঃশাসনের দ্বারা দ্রৌপদীর বস্ত্রহরণ সম্ভব হয়নি: হয়তো নারী বলেই ব্যাসদেবের কিছুটা দুর্বলতা ছিল কিন্তু এক্ষেত্রে পুরুষ, এবং এমন পুরুষ যাদের মন্ত্র: রাগ, লজ্জা; ভয় তিন থাকতে নয়, কাজেই দ্বাপরের পরাজিত গ্লানি মুছে গেল কলিতে, অন্য ছদ্মবেশে!

অল্প সময়ের মধ্যেই সত্যাগ্রহীদল সমতল ভূমিতে নাগা সন্ন্যাসীর রূপ ধারণ করলো!

বিভূতি, সুখময়ের এলো এক দুর্বল মুহূর্ত। তারা ছুটে গিয়ে ঝাঁপ দিলে নদীর জলে। আবক্ষ জলের মধ্যে তাদের মস্তক নত হয়ে পড়লো। বাকি তিনজন বসে রইল অটল অচল। অমিতাভ চাপাকণ্ঠে বললে, বিশ্বাসঘাতক!

সুধীর অগ্নিদৃষ্টিতে তাকালো বিভূতি সুখময়ের দিকে।

দারোগা চেঁচিয়ে উঠলেন, নির্লজ্জ বেহায়াগুলো তবু বসে!

আশা করেছিলো নূতন চালে আজ জয়ী হবে—ক্ষিপ্ত হয়ে বাতাসে শিস্ দিতে দিতে বেতের বাড়ি চললো উলঙ্গ, নিস্পন্দ দেহ তিনটের ওপর।

বেতের শিস্ বন্ধ হতেই সবাই শুনলে, দারোগা বলছেন, শালা লোককো দরিয়ামে ফ্যেকো!

উলঙ্গ মূর্তিগুলো তার চোখেও অসহ্য লাগছে; দারোগা নিজেই সুনির্মলকে হেঁচড়ে নদীর জলে ঠেলে দিলে! অন্য পুলিশেরা বাকী দুজনকে টেনে নিয়ে ফেললো।

ক্ষতস্থানগুলোতে বৈদ্যুতিক আঘাত পাওয়ার মত জ্বলন্ত অনুভূতি তিনজনেরই শরীরকে কাঁপিয়ে দিলে।

পাড় বেয়ে ফিরলো দারোগা পুলিশের দল।

সুধীর বললে বিভূতি, সুখময়কে লক্ষ্য করে, এতো দুর্বল মন নিয়ে সত্যাগ্রহী হওয়া উচিত হয়নি।

ভর্ৎসনার সুর চাবুকের চেয়ে জোরে এসে লাগলো দুজনকে, বিভূতি বললে লজ্জিতকণ্ঠে, আমায় ক্ষমা করো সুধীর আর কখনও হবে না।

সুখময়ও কি বলতে যাচ্ছিলো তাকে থামিয়ে দিয়ে দৃঢ়তার সঙ্গে বললে অমিতাভ, দেখ সুধীরদা, আমাদের এখন কাপড়ের দাবী নিয়ে পুলিশের কর্তাদের সামনে হাজির হতে হবে। পিছাবনী থানার সামনে আমরা এই অবস্থায় সত্যাগ্রহী দাবী তুলবো—কাপড় দাও।

বারান্দাটায়, সুরেশকে দেখে তার মুখটা খুশিতে ভরে উঠলো। আজ কাল তার পাথর খোদাই মুখখানা, দেহের কোমল বঙ্কিম রেখাগুলো, বয়সের গরিমায় আরো সুন্দর হয়ে উঠেছে, শ্রাবণের ভরা নদীর গভীরতা ও অজানা আশঙ্কা মিশিয়ে সে যেন একটা ভয়াল সুন্দর রূপের আলেখ্য।

মুগ্ধ বিস্ময়ে সুরেশ চাইল তার দিকে, অনাদি চঞ্চলতায় ভোরে উঠলো তার মন। এত কাছে এসেও তৃপ্তি নেই, মালতীকে পাওয়া না পাওয়ার দ্বন্দ্বে তার মন ক্লান্ত। মালতীর ব্যবহারে সে খুঁজে পেয়েছে এমন একটা নির্লিপ্ত কাঠিন্য, একটা অবনমিত অস্বীকার সীমানা যা তাকে ব্যথায় ক্ষিপ্ত করে তোলে। ক্ষণেকের জন্যে মনে হয় এ-বাধা সে মানবে না, সে সর্বজয়ী হবে, কিন্তু মালতীর চোখে ফুটে ওঠা দুর্লঙ্ঘ্য নিষেধের দৃঢ় সীমারেখায় ঠেকে তার কামনা শামুকের মতই চকিতে আত্মগোপন করে।

মালতীর পাশে মেজেতেই বসে পড়লো সুরেশ।

তার দিকে চটুল চোখে চেয়ে বললে মালতী, ডাক্তারবাবু যে আজ বড় সকাল সকাল রুগী দেখতে এলেন?

রুগীর বিকার দেখা দিয়েছে কিনা, তাই—বললে সুরেশ।

একটা ক্ষীণ হাসির ঝিলিক খেলে গেল মালতীর কণ্ঠে, সে চোখ নামিয়ে বললে, বিকার ডাক্তারের, না রুগীর সেইটেই আগে ঠিক হোক।

আচ্ছা মালতী তুমি আমাকে ডাক্তারবাবু বলে ডাক কেন?

কি বলে ডাকবো?

কেন সুরেশ বলে।

বিমনা হয়ে মালতী কথাটার মোড় ঘোরালে, জানেন বাবা ললিতের পড়া ছাড়িয়ে দিচ্ছেন?

ও সব কথা পরে শুনবো আগে আমার জবাব দাও।

মালতী চুপ করলো, সুরেশ তার একটা হাত টেনে নিয়ে

অনুনয়ের ভঙ্গীতে বললে, বলো মালতী এখনও কেন তোমার এই সংকোচ ?

লজ্জা করে—সময় এলে চেষ্টা করবো। জড়িত কণ্ঠে বললে মালতী।

আগামী অঘ্রাণে আমাদের বিয়ে ঠিক করলাম—জোর দিয়ে বললে সুরেশ।

হালকা পালকের মত নেচে উঠলো মালতীর মন, সন্দেহের মেঘ ফিকে হয়ে এলো, সে তাড়াতাড়ি উঠে দাঁড়িয়ে বললে দাঁড়ান, আপনাকে চা করে দি ভুলেই গেছলাম।

এসে বললেন, আমাদের মনে রেখো ভাই, আমরা বড় গরীব বড় দুঃখী ; ছেলেদের চোখে জল ভরে এলো ; এ যেন তাদের অতি প্রিয়জনের কাছে বিদায় নেবার বিষাদমুহূর্ত। কথা বলার শক্তি হারিয়ে ফেলেছে।

নিজেকে সংযত করে বললে অমিতাভ, সোনাদি এর মধ্যেই বিদায় দিচ্ছেন কেন ? আমরা গ্রামের ধারেই তো থাকবো ?

গ্রামের মধ্যে থাকা আর ধারে থাকা এক নয় ভাই। একটু ক্ষীণ হাসি ফুঠে উঠলো সোনাদির ঠোঁটে।

মানিক এসে বললে, মা, বাবা এদের একবার দেখতে চান।

অমিতাভ চমকে উঠলো, তাইতো এ বাড়িতে এতদিন বাস করলো অথচ গৃহস্বামীর সঙ্গে দেখা করেনি। সে অপরাধীর মত তাড়াতাড়ি বললে, সোনাদি চলুন আমাদেরও দেখা করতে হবে।

উঠোন পেরিয়ে চললো সবাই। ছেলেদের মনে অদ্ভুত কৌতূহল, সোনাদির স্বামী।

গৃহস্বামীর ঘরের দেওয়ালে সাদা খড়ির নিপুণ আলপনা আঁকা, একপাশে একটি ফাঁকা খাটিয়া, অন্যদিকে একটা খাটিয়ায় শায়িত নরদেহ। রোগ-পাণ্ডুর মুখের দিকে চেয়ে যে কোন বয়স ঠিক করা যায়। মুদিতচক্ষু, অবশ শরীর শিথিলভাবে পড়ে আছে খাটিয়ায় মিলিয়ে।

সোনাদি তাঁর কাছে গিয়ে উঁচু গলায় বললেন, ছেলেরা তোমাকে দেখতে এসেছে। ধীরে ধীরে চোখ খুলে তাকালেন তিনি ছেলেদের দিকে ; জীবনে এমন নির্জীব শূন্যদৃষ্টি অমিতাভ দেখেনি। অনেক কষ্টে হাতটা কাঁপাতে কাঁপাতে কি যেন ইঙ্গিত করলেন।

সোনাদি বললেন, উনি তোমাদের বসতে বলছেন।

অমিতাভ দেখলে, তাঁর গালের কুঞ্চনগুলো অক্ষম চেষ্টায় বার বার দুলে উঠছে। সে একবার সোনাদি একবার তাঁর মুখের দিকে চাইল। মন তার কোথায় যেন চলেছে। এই তো সমাজের

সত্য রূপ, একদিকে সোনাদি অন্যদিকে পক্কাঘাতে পঙ্গু তাঁর স্বামী। সে যেন স্বপ্ন দেখছে।

আপনভোলা মহেশ, পাত্র হাতে এসে দাঁড়ালো অন্নপূর্ণার দ্বারে, সেখানে দেখলে অন্নপূর্ণার মূর্তি গেছে বদলে, সৃষ্টিময়ী শক্তির পা জড়িয়ে যাচ্ছে স্থবির মহাকালের দেহে। না না এ হতে পারে না, সোনাদির স্বামী এ নয়—ছটফট করে উঠে পড়লো অমিতাভ, সঙ্গে সঙ্গে ছেলের দল।

দরজার চৌকাট ধরে একদৃষ্টে চেয়ে রইলেন সোনাদি তাদের গতিপথের দিকে।

কি যে করি জ্যাঠামশায় ? চাকরীর সন্ধানে কদিন ঘোরাঘুরি করলুম কিন্তু কোনো আশা দেখছি না।—আপনি যদি একটা কিছু...

আমি আর কি-বা করতে পারি ?—একটু থেমে আবার শুরু করলেন—তবে আমার মনে হয় তুমি সাধারণ লাইনে না গিয়ে ছবি আঁকার লাইনে গেলে ভাল হয়।

ক্ষণেকের জন্যে মুখটা উজ্জ্বল হয়ে উঠলো ললিতের, সে বললে, ছবি আঁকায় কি পয়সা রোজগার হবে ?

তা হবে না বটে, তবে যদি কোন ব্যবসা প্রতিষ্ঠানে ডিজাইন, সাইনবোর্ড, বিজ্ঞাপন তৈরির কাজ করো তা হলে চর্চাও থাকবে আর পয়সাও কিছু কিছু পাবে।

কথাটা ললিতের মন্দ লাগলো না সে তাড়াতাড়ি বললে, জ্যাঠা-মশায় আপনার জানাশোনা কোন লোক আছেন কি যিনি আমাকে এই সম্বন্ধে কিছু সাহায্য করতে পারেন ?

একজন লোককে আমি জানি সে যদি তোমাকে তার এ্যাসিস্‌টেণ্ট করে নেয় তা হলে ও কাজের হদিশ বুঝতে পারবে, আমি তাকে কাল একবার বলে দেখবো।

আনন্দে নেচে উঠলো ললিতের মনটা, ভরসা হলো, উনি কাউকে বললে সে না করতে পারবে না।

আপনার একটা ছবি এ কে দেবো জ্যাঠামশায় ? আমি কি রকম আঁকতে পারি বুঝতে পারবেন।

দুর পাগল ! আমার ছবি আঁকতে হবে না।

রামকালীবাবুর গুরুগম্ভর মুখখানা হাসিতে ভরে উঠলো।

বায়নার সুর ধরে বললে ললিত, বেশি দেরী হবে না জ্যাঠামশায়, পেন্‌সিলে আঁকবো, আপনার স্নানের সময়ের আগেই শেষ করে দেব।

॥ ৩ ॥

লালকাঁকড়ের বাঁধ দেওয়া বিঘে দুয়েক পুকুর। পাড়ের ওপার গোটা কতক বট, অশ্বত্থগাছের নমুনা দেখে মনে হয় বাঁধটার বয়স হয়েছে; বহুদিনের পোক্তা বাঁধন আজও কোথাও চিড় ধরেনি, এই বাঁধের দৌলতে সম্মুখের ঢালুটার যত জল এসে জমা হয় এই পুকুরে। জলটায় গেরুয়া রং হলেও সাঁতার-জল থাকে গ্রীষ্মকালে। উত্তরে আমকাঁঠালের বাগান, দু-একটা লিচুর গাছও খুঁজে বার করা যায়। বাগানের উত্তর পশ্চিম কোণ ঘেঁষে সোনাদির গ্রাম।

সত্যাগ্রহীরা এই পুকুরপাড়টাই তাদের বাসের জন্যে বাছাই করেছে।

রোজ সকালে স্নান করে নদীর ধারে, ফিরে এসে রান্না করে আম-বাগানে। দৈনিক পিছাবনী শিবিরের বরাদ্দ নিয়ে আসে একটি স্বেচ্ছাসেবক, কোনদিন চাল ডাল, কোনদিন চাল আলু, আবার কোন দিন শুধু চাল। রান্নার সময় লাগে কম; ঘণ্টাখানেকের মধ্যে খাওয়া দাওয়া সেরে অমিতাভরা পায় অফুরন্ত অবসর।

অন্ধকার হলেই চাটাই পেতে ঘুমের ব্যবস্থা করে, প্রথম দিকটা ঘুমিয়ে পড়ে সবাই, তারপর গভীর রাত্রে ঘুম ভেঙ্গে যায়: চারিদিকের নিস্তব্ধ নিঝুম নিরালার মধ্যে তারাভরা আকাশটাকেই নিকটতম মনে হয়! দক্ষিণের আদিগন্ত-বিসর্পিত প্রান্তরের অপর প্রান্ত থেকে সমুদ্রের ঝোড়ো হাওয়ার চাপে শরীরগুলো যখন কন্‌কনিয়ে ওঠে তখন উঠে গিয়ে কোন গাছের আড়ালে বসে বলে, পুলিশকে পারা যায়, কিন্তু এই হাওয়ার জ্বালাতেই পালাতে হবে দেখছি। অফুরন্ত বাতাসের ঢেউগুলো যেন একবার থামলে বাঁচে তারা।

পুলিশের দল এখনও এই ডেরার সন্ধান পায়নি। নদীর ধারে দেখলেই বলে,—শালারা থাকেই বা কোথায়, খায়ই বা কি?—গ্রামের

লোকদের ওপর শাসানি চলে, সন্ধানের আশায় কাউকে বেঁধে মারে কাউকে পয়সার লোভ দেখায়।

বেতে যখন বশ হলো না, তখন অন্য পন্থা ধরলেন দারোগারা। থাকা খাওয়ার আস্তানাগুলো উড়িয়ে পুড়িয়ে দিলে বিদেশী ছেলেগুলো পালাতে পথ পাবে না তাই ইদানিং ডেরার সন্ধানে শিকারী কুকুরের ঘ্রাণশক্তি ধার নিয়ে ছুটে বেড়াচ্ছেন গ্রাম থেকে গ্রামান্তরে।

অমিতাভদের এ আস্তানা পুলিশের ধারণা বহির্ভূত, আজগুবী ব্যাপার। কাজেই এখানে নির্বিবাদে কেটে যাচ্ছে দিনগুলো।

সকালবেলা স্নান করা সেরে গোপন পথে ঘুরে ঘুরে তারা এসে পৌঁছলো আমবাগানে। সকালের চিড়েগুলো পেটের মধ্যে ফুলে ফেঁপে আবার কোথায় মিলিয়ে গেছে। সবাই মিলে পুকুরের আঁজলা-কতক জল খেয়ে পেটের চুপসেযাওয়া চামড়াগুলো একটু উঁচু করে নিয়ে বসলো গাছের ছায়ায় হাত-পা ছড়িয়ে।

সুনির্মলের রান্না করার পালা আজ, সে না বসেই ভাত সেদ্ধ করার ব্যবস্থায় মন দিলে। অমিতাভ হেসে বললে, দেখ ভাই আজও পুড়িয়ে ফেলো না ভাতটা—চিড়েও নেই—আজ তা হলে স্রেফ্ হরিমটর।

রোদে তামাটে হওয়া সুনির্মলের মুখটা আরো যেন লালচে হয়ে এলো, সে তাড়াতাড়ি বললে, না না আজ পুড়বে না। আতপ চাল যে অত চট করে সেদ্ধ হয় সেদিন জানতুম না।

তা হলে একটা শিক্ষা হলো কি বলো?

সুনির্মলকে চোখের একটা ইসারা করে বিভূতি বললে, আর একটা শিক্ষা হয়েছে। বলবো নাকি হে?

তার দিকে চেয়ে ঘোর আপত্তি জানালো।

অমিতাভ বললে বিভূতির দিকে চেয়ে, বল হে বল, সত্যাগ্রহীদের কিছু গোপন করতে নেই।

ওই যে কর্তাদের ছোঁড়াটা—অমি, অমি—আমাকে কি না পথ আগলে দাঁড়ায়, বলে মদ খেতে পাবেন না—হুঃ মদ খাব না তো খাব কি বাবা, আছে কি দুনিয়ায়। বোকার মত হেসে উঠলেন ব্রজবিহারীবাবু।

ললিত কোন কথা না বলে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাঁর দিকে একবার চেয়ে বেরিয়ে গেল ঘর থেকে। মালতী একপাশে দাঁড়িয়ে আঁচল দিয়ে মুখ ঢাকলে।

॥ ৬ ॥

দিনের পর দিন অমিতাভদের শুন করা চলেছে। শুন করাটা এখন অতিরিক্ত, পুলিশকে কর্মক্লান্ত করাই সংগ্রামের আসল রূপ হয়ে দাঁড়িয়েছে। মানিকের কোকিলের দল গাছে গাছে বসে তাদের নানা কাজে সাহায্য করে; তাদের চাতুরী—সুচতুর পুলিশদলকেও হার মানিয়েছে। এই কেন্দ্রে এখন মাত্র তিনজন আছে, অমিতাভ, সুনির্মল, বিভূতি। পুলিশের দলকে নদীর পাড়ে দেখে অমিতাভ আদেশ দিলে ঠিক হয়ে বসতে। শুন করার ভঙ্গীতে সবাই বসে পড়লো।

দারোগা তাদের কাছে এসে দারুণ বিরক্তিতে বললেন, না এই তিনটেকে পারা গেল না। কাঁথি না পাঠিয়ে উপায় নেই—এই ছোঁড়ারা চল্ তোদের গ্রেপ্তার করলুম।

চলার কোন লক্ষণ দেখা গেল না, বরং যেন বেশি করে চেপে বসলো তিনজনেই।

গলাটা চড়িয়ে বললেন দারোগা, শালারা কি এমনি যাবে কাঁধে চেপে যাবার মতলব—আচ্ছা ফন্দী বার করেছে আজকাল। পুলিশদের আদেশ করলেন, তিনটেকে কাঁধে ওঠাও—গাঁয়ে গরুর গাড়ী ভাড়া করে কাঁথি জেলে চালান দিতে হবে।

দুজন করে পুলিশ এক একজন সত্যাগ্রহীকে মড়া ঝোলানো করে নিয়ে চললো দারোগার পেছনে। চাপা হাসিতে পেটে খিল ধরবার জোগাড় হয়েছে সুনির্মলের; সেটা ভোলার জন্যে সে চিৎকার করে উঠলো বন্দেমাতরম্। সবাই তাতে যোগ দিলে, দারোগা ভ্রুকুটি করে ফিরে তাকিয়ে আবার এগিয়ে চললো।

গ্রামে গরুর গাড়ীতে চাপবার সময় অমিতাভ দেখতে পেলে রাস্তায়

॥ ৭ ॥

কাঁথি জেলে এসে অনেক দিন পর আরামে দিবানিদ্রা দিচ্ছে অমিতাভ। সুধীরের ঠেলাঠেলি আর বন্দেমাতরম্ চিৎকারে তার ঘুম ভেঙ্গে গেল। চোখ খুলতেই সুধীর বললে, উঠে পড়ো। হাঁদা এসেছে। কথাটা বুঝতে না পেরে বোকার মত চেয়ে রইল অমিতাভ।

এখানের পুলিশের বড়কর্তা, জেল পরিদর্শনে এসেছেন। অদ্ভুত লোক, হাসতে হাসতে লাথি চালান সত্যাগ্রহীদের ওপর, যেন ফুটবলে পেনালটি কিক্ করছেন।

বাইরে বেরিয়ে দেখলে সার দিয়ে সত্যাগ্রহীরা দাঁড়িয়ে এবং একজন সায়েবি পোশাকপরা লোক সদর্পে পায়চারী করছেন। ছোট্ট মেয়েলি ছাঁদের চেহারা, মুখে সুকুমার লালিত্য, রং ধবধবে, কোঁকড়া চুলগুলো ব্যাক্‌ব্রাশ করা।

সুন্দর কান্তি এই লোকটি হুদা সাহেব! যাঁর নির্দেশে চলেছে কাঁথির যা কিছু।

অমিতাভ যেন বিশ্বাস করতে পারলো না। ফিরে ফিরে তাকালো তাঁর দিকে।

মুচকি হেসে সুধীরের মুখের দিকে দেখছেন হুদা; সেও চেয়ে আছে সোজা।

কোথায় বাড়ি হে? প্রশ্ন করলেন পুলিশকর্তা।

ঢাকা। উত্তর দিলে সুধীর।

চোখ দেখে টেররিস্ট মনে হচ্ছে, কি হে টেররিস্ট নাকি?

অহিংস সৈনিক, সত্যাগ্রহী।

ওটা ভাঁওতা। জোরে হেসে উঠলেন পুলিশ কর্তা। ঢাকায় আমারও বাড়ি, চিনে রাখছ নাকি?

চেপে ধরে। বহুক্ষণ পরে রক্ত যখন থামলো, অমিতাভ তখন ক্লান্তিতে ঢলে পড়েছে।

মেদিনীপুর স্টেশনে তাকে আস্তে আস্তে ধরে নামানো হলো, অন্য সত্যাগ্রহীদের কাঁধে করে নামালো পুলিশদল।

স্টেশনের বাইরে একটা গাছের গোড়ায় তাদের বসিয়ে পুলিশ অদৃশ্য হলো।

লজ্জায় লাল হয়ে পূর্ণিমার চাঁদ তখন একটা তামার থালার মত দেখা দিয়েছে পূর্বাঞ্চলে।

দারুন দুশ্চিন্তায় সত্যাগ্রহীরা ঝুঁকে পড়লো অমিতাভর মুখের দিকে : তারা কি করবে, কোথায় যাবে, কার কাছে সাহায্য নেবে। কিছুই ঠিক করতে পারছে না। আকুলভাবে বারে বারে তাকাতে লাগলো ট্রেন থেকে নামা জনস্রোতের দিকে।

মোটরের একটা তীব্র আলো এসে পড়লো তাদের মুখে। বিস্মিত ছেলের দল লক্ষ্য করলে গাড়ীটা তাদের সামনে এসে থেমেছে।

গাড়ী থেকে নেমে এলেন একটি মধ্যবয়সী ভদ্রলোক ও একটি স্ত্রীলোক!

তাদের কানে এলো—জ্যাঠামশায়! মিনটুদা নিশ্চয়!

আশায় ভোরে উঠলো ছেলেদের মন। ভদ্রলোককে ছাড়িয়ে মেয়েটি এগিয়ে এসে ঝুঁকে পড়লো অমিতাভর দিকে, আর্তস্বরে তার মুখ দিয়ে বেরিয়ে এলো, মিনটুদা মিনটুদা, জ্যাঠামশায়!

ভাল করে দেখে ভদ্রলোক বললেন, তাই তো হারাধনের ছেলেই তো বটে! ছেলেদের দিকে চেয়ে জিজ্ঞেস করলেন, এ এখানে এলো কি করে? অজ্ঞান হয়ে গেছে মনে হচ্ছে।

সত্যাগ্রহীদের একজন কাঁথি জেল থেকে এ পর্যন্ত সমস্ত ঘটনা বলে গেল।

রুনু তখন অমিতাভর বুকে হাত দিয়ে ডাকছে, মিনটুদা মিনটুদা।

পড়েছে অমিতাভর মোমের মত মুখে, রুনুর ব্যগ্র চোখের দৃষ্টি, স্থির হয়ে পড়ে আছে সেখানে।

শিবকালীবাবু নিদ্রিত। চাঁদের আলো সরে গেছে অমিতাভর বুকে, বেতের ঘায়ে ফাটা ফাটা দাগগুলো চকচক করছে। তার রুক্ষ চুলের মধ্যে আঙুল চালিয়ে যাচ্ছে রুনু!

হঠাৎ অমিতাভর বুকটা ফুলে উঠলো। সে চোখ খুলে চাইলে, ঝুকে পড়লো রুনু তার মুখের দিকে, উৎফুল্ল স্বরে ডাকলে, মিনটুদা। মিনটুদা।

অর্থহীন দৃষ্টিতে চেয়ে রইল অমিতাভ তার মুখের দিকে।

আমি। আমি মিনটুদা! চিন্‌তে পাচ্ছ না?

একটা ক্ষীণ হাসির রেখা ভেসে গেল তার ঠোঁটে।

জ্যাঠামশায়, জ্যাঠামশায়। মিনটুদার জ্ঞান হয়েছে!

শিবকালীবাবু ধড়মড়িয়ে উঠে গেলাসে ওষুধ ঢেলে বললেন, এটা তাড়াতাড়ি খাইয়ে দাও মা।

গেলাসটা মুখের কাছে ধরে রুনু বললে, ওষুধ খেয়ে নাও মিনটুদা, অমন করে চেয়ে আছ কেন?

অমিতাভ কিছুই বিশ্বাস করতে পারছে না। সে বুঝি স্বপ্ন দেখছে। হাঁ করে ওষুধ খেলে স্বপ্ন ভেঙ্গে যাবার ভয়ে কোনো কথা বললে না!

তার দিকে ঝুঁকে পড়ে ব্যাকুলভাবে বললে রুনু, অমন করে চেয়ে থেকো না, কথা বলো মিনটুদা।

আমি কোথায়? দুর্বলকণ্ঠে বললে অমিতাভ!

জ্যাঠামশায় তোমাকে আমাদের বাড়িতে তুলে এনেছেন।

রুনু!

হ্যাঁ আমি মিনটুদা।

শিবকালীবাবু উঠে এসে বললেন, গরম দুধ একটু খাইয়ে দিলে হয় না?

লজ্জা করে যে। জড়িতকণ্ঠে উত্তর দিল মালতী।

তুমি আমায় আজকাল এড়িয়ে চলো মানে অবজ্ঞা করো।

তার কণ্ঠস্বরে ভীত হয়ে পড়লো মালতী, সে তার মাথাটা সুরেশের বুকে চেপে ধরে বললে, না না ভুল।

সুরেশ তাকে দু হাতে জড়িয়ে ধরলো, রোমাঞ্চিত হয়ে উঠলো মালতীর সমস্ত শরীরটা, সেও নিজেকে যেন আলগা করে ছেড়ে দিলে।

সুরেশ তার মুখখানা তুলে ধরে লোভী ঠোঁট দুটো চেপে ধরলে তার কম্পিত ঠোঁটে।

মুহূর্তের মধ্যে মালতীর চোখের সামনে থেকে সব কিছু মিলিয়ে গেল, এলিয়ে পড়লো সে।

মালতী অনুভব করলে, সুরেশের সাপের মত পাঁচটা আঙুল নেবে যাচ্ছে তার শরীরের ওপর দিয়ে।

প্রাণপণ শক্তিতে নিজেকে মুক্ত করে, চাইল সুরেশের দিকে: দেখলে সুরেশের চোখে অদ্ভুত মিনতিভরা দৃষ্টি। সে আবার হাত বাড়ালো তাকে ধরবার জন্যে। বেদনাতুর কণ্ঠে বললে মালতী, না, না, সুরেশ।

উন্মত্তের মত সুরেশ তাকে চেপে ধরলে বুকের মধ্যে; তার ক্ষিপ্ত শরীরটাকে দু হাতে সরিয়ে এক ঝটকা মেরে উঠে গেল মালতী। দূরে দাঁড়িয়ে শঙ্কিত দৃষ্টিতে চাইলে সুরেশের দিকে, সমস্ত শরীরটা থরথর করে কাঁপছে।

ক্রুর একটা হাসি ফুটে উঠলো সুরেশের মুখে; সে বললে কঠিন স্বরে, সতীপণা! টাকা নেবার সময় এ জ্ঞানটা থাকে কোথায়।

ভূ-দোল লেগেছে মালতীর পায়ের তলায়, সে দুহাতে মুখ ঢেকে বসে পড়লো। তার কাছে এগিয়ে গিয়ে সুরেশ আরো বীভৎস ভাবে বললে, ন্যাকামির শেষ করো নয় তো পেটে ভাত জুটবে না।

যাকে মেরে কাঁদানো যেত না, সে আজ সামান্য আঘাতেই ভেঙ্গে পড়ে। অনির্বচনীয় আকর্ষণে অমিতাভর মনটা ব্যথাতুর হয়ে উঠলো, সে রুন্নুর একটা হাত টেনে নিয়ে বসালে পাশের চেয়ারে, মৃদুভাবে বললে, রুন্নু মনে পড়ে আমাদের সেই দিনগুলো ?

পড়ে মিনটুদা—জড়িতকণ্ঠে উত্তর দিলে রুন্নু।

আবার কি ফিরিয়ে আনা যায় না সেই দিনগুলো ?

খুশিতে ভরে উঠলো রুন্নুর মন, সে মাথাটা ঘুরিয়ে বললে, কি জানি।

অমিতাভর মনের কোণে তুফান এলো ! স্বপ্নজড়িত কণ্ঠে সে বললে, জান রুন্নু এটা কার দেশ ?

বিস্মিত রুন্নুর চোখ তার ওপর সোজা এসে পড়লো, সে বললে জোর দিয়ে বিদ্যাসাগরের। প্রশ্নের আসল অর্থ বুঝে লজ্জায় রাঙ্গা হয়ে উঠলো রুন্নু, তার গাল বেয়ে দুফোঁটা অশ্রু গড়িয়ে পড়লো।

চমকে উঠলো অমিতাভ, সে বুঝি এই কথায় রুন্নুর মনে ব্যথা দিয়েছে ! অনুশোচনার স্বরে বললে সে, আমায় ক্ষমা করো রুন্নু —আমায় ক্ষমা করো।

ক্ষীণ হেসে রুন্নু তার হাতদুটো ধরে বললে, পাগলের মত কি বোকছো। চলো তোমাকে চরকা কাটতে শিখিয়ে দি।

লজ্জিত অমিতাভ তার পেছনে পেছনে গিয়ে ঢুকলো অন্য ঘরে। মেজেতে অনেকগুলো চরকা সাজানো, একটার দিকে আঙুল দেখিয়ে বললে রুন্নু, ওইটেতে তুমি বসো, সহজে শিখতে পারবে।

অমিতাভ মাথা নিচু করে গিয়ে বসলো চরকার সামনে ; একটা লম্বা তুলোর পাঁজ তার হাতে ধরিয়ে বললে রুন্নু, এই রকম ভাবে ধরো—তারপর ডান হাতে চাকা ঘোরাও বাঁ হাতে পাঁজ টেনে যাও। যন্ত্রচালিতের মত সে রুন্নুর কথা অনুযায়ী চেষ্টা করতে লাগলো ; দুটো হাত কিছুতেই সমানে চালাতে পারছে না ; একটা হাত

রামকালীবাবু যেন মহাসমুদ্রের গর্জন শুনতে পাচ্ছেন; তার স্ফীত উত্তাল তরঙ্গ কে রোধ করবে—কে রোধ করবে এই অনিবার্য তরঙ্গের রুদ্রগতি।

বিরক্ত কুঞ্চিত মুখে ঘরে ঢুকলেন ব্রজেন্দ্রনাথ। চিন্তাকুল রামকালীবাবুর পাশে বসে ডাকলেন, দাদা।

কি? বললেন রামকালীবাবু তাঁর দিকে চেয়ে।

ওই ছোঁড়াটা সত্যিই সুরেশ ডাক্তারকে খুন করেছে।

কি করে জানলে?

ওই যে পুলিশ এসেছে তার খোঁজ করতে।

পুলিশ এসেছে।—চমকে উঠে পড়লেন তিনি—এ আমি বিশ্বাস করি না, এ হতে পারে না চলো আমার সঙ্গে পুলিশের কাছে, ললিত খুন করতে পারে না।

ললিতদের দরজায় দাঁড়ানো দারোগাকে গিয়ে প্রশ্ন করলেন রামকালীবাবু উত্তজিত কণ্ঠে, কি ব্যাপার, কিসের জন্যে এসেছেন এখানে?

তিনদিন পুর্বে এক ডাক্তার খুন হয়েছে, ললিত নামে এই বাড়ির একটি ছেলেকে দেখা গেছলো খুনের পরেই, তার ডিসপেনসারির থেকে ছুটে বেরিয়ে আসতে, সন্দেহ আরো গাঢ় হয়ে উঠেছে সে সেইদিন থেকে ফেরার হওয়ায়—বললে দারোগা।

মিথ্যা। এ আমি বিশ্বাস করি না।

বিশ্বাস আপনি না করুন, আদালত বিশ্বাস করবে।

খানাতল্লাসী শেষ করে পুলিশদল ফিরে গেল। ঘরের মধ্যে থেকে একটা চাপা কান্না ভেসে এলো রামকালাবাবুর কানে, তিনি ভেতরে গেলেন।

বালিশে মুখগুঁজে মালতী কাঁদছে দেখে সস্নেহকণ্ঠে জিজ্ঞেস করলেন তিনি, মালতী মা কি হয়েছে আমায় সত্যি বলো।

॥ ১২ ॥

মেদিনীপুরের আদালত লোকে লোকারণ্য। সুপ্রসিদ্ধ জমিদার শিবকালী মিত্র, তাঁর ভ্রাতুষ্পুত্রী, ও অমিতাভর বিচার হবে।

একটা রেলিংঘেরা জায়গার মধ্যে এক ধারে বসে শিবকালীবাবু, অন্যদিকে একটা বেঞ্চিতে বসে রুনু ও অমিতাভ।

গুরুগম্ভীর স্বরে সরকারী উকিলকে বললেন বিচারক, ওঁদের আইনজ্ঞের দ্বারা বিচার প্রার্থনা আমি মঞ্জুর করছি।

আদালত পিওন হাঁকলো, অমিতাভ রায় হাজির।

বুকটাকে চিতিয়ে তড়াক করে উঠে দাঁড়ালো অমিতাভ। বিচারক তার দিকে চেয়ে বললেন, আমার মনে হয় সুবিচারের জন্যে তোমার আত্মপক্ষ সমর্থন করা উচিত—এখনও করতে পারো।

চকিতে কাঁথির দৃশ্যগুলো ভেসে উঠলো অমিতাভর চোখে, সে রূঢ়কণ্ঠে বললে, অবিচারের রাজ্যে সুবিচার প্রত্যাশা করি না, বিচারের ন্যায় দণ্ড অত্যাচারীর জন্যে নয়।

রক্তজবার মত লাল হয়ে উঠলো বিচারকের মুখমণ্ডল; কাগজে খানিকটা লিখে, ইসারায় সরে যেতে বললে অমিতাভকে, পিওন হাঁকলো, সুমিত্রা দেবী হাজির।

রুনু উঠে দাঁড়ালো, বিচারক নম্রভাবে বললেন, আমার অনুরোধ আপনি মুচলেকা দিন। আপনারা স্ত্রীলোক, একি আপনাদের সাজে।

স্ত্রীলোক কি স্বাধীনতা চায় না, চিরদিন মুচলেকা দিয়েই ক্ষান্ত হবে। এ কিছুতেই সম্ভব নয়।

উত্তেজিত হবেন না, ভেবে দেখুন।

ভাববার কিছু নেই, আপনার বিচার শেষ করুন।

বিচারক লেখা শেষ করলেন, পিওন হাঁকলো, শিবকালী মিত্র।

॥ ১ ॥

গাঢ় অন্ধকার ভেদ করে চলেছে ট্রেন : ললিতের মনে হচ্ছে একটা নিরবচ্ছিন্ন অমানুষী অট্টহাসির ছন্দে কাল পিরাণ ঢাকা তমস্বিনীর দীর্ঘশ্বাস কেঁপে কেঁপে মিলিয়ে যাচ্ছে। এর যেন শেষ নেই। ঘণ্টার পর ঘণ্টা সে এই একই জায়গায় বসে ; কামরার অন্য যাত্রীদের দিকে ভাল করে চাইতে ভরসা পায়নি ; অদ্ভুত একটা ভীতির শিরশিরানি মাঝে মাঝে বয়ে চলেছে তার মেরুদণ্ডের ওপর দিয়ে, ভেতরটা বুঝি শুকিয়ে কাঠ হয়ে যাবে।

জানালার বাইরে মাথাটা এগিয়ে দিয়ে চাইল ললিত : চাবুকের মত হাওয়ার ঝাপটা এসে লাগলো মুখে ; সীমাহীন অন্ধকারের মধ্যে আদিম সরীসৃপের মত এঁকে বেঁকে চলেছে ট্রেনখানা।

হঠাৎ তার মনে হলো, এ গতির কোন মানে নেই, কোন লক্ষ্য নেই। এই সর্বগ্রাসী তমিস্রা বুঝি অজেয়। এর দম্ভ সে চূর্ণ করবে : শরীরটা আর একটু বাড়িয়ে দিয়ে শুধু একটা পায়ের ঝাঁকুনি। কথাটা ভাবতেও একটা আরামের নিশ্বাস বেরিয়ে এলো, শরীরটাকে জানলার বাইরে আরো খানিকটা এগিয়ে দিয়ে ললিত চোখ বুজলে।

পাশে বসা বাঙ্গালী ভদ্রলোক চেঁচিয়ে উঠলেন, আরে ও মশায়, পড়ে যাবেন যে।

নিজেকে তাড়াতাড়ি সংযত করে নিলে ললিত, বুকের ভেতরটা ধকধক করে নেচে উঠলো। ঘন ঘন নিঃশ্বাস নিয়ে সে বললে, আমাকে একটু জল খাওয়াতে পারেন দয়া করে ?

বেঞ্চির তলায় কুঁজো থেকে এক গেলাস গড়িয়ে দিয়ে বললেন ভদ্রলোকটি, আপনাকে অসুস্থ মনে হচ্ছে ?

আজ্ঞে হ্যাঁ, শরীরটা ভাল নেই।—অজানা আশঙ্কায় ললিতের

টাঙ্গাটা একটা ছোট্ট গলির মুখে ঘুরে গেল, দু ধারের চাকা বুঝি লেগে যাবে দুদিকের দেওয়ালে।

টাঙ্গাওয়ালা দক্ষতার সঙ্গে ঘোড়াটাকে চালিয়ে নিয়ে গিয়ে থামলো একটা পাথরের বাড়ির সামনে।

উর্দু ও ইংরাজিতে লেখা হিন্দু হোটেলের সাইন বোর্ড দেখে ললিত সুটকেশ হাতে নেমে পড়লো।

টাঙ্গাওয়ালাকে ভাড়া মিটিয়ে চারিদিকে চেয়ে নিশ্চিন্ত মনে পাথরের দরজা দিয়ে গলে গেল সে ভেতরে।

গোরা সৈন্যরা যারা এখানে থাকে তারাও ওদিকে যেতে সাহস করে না।

একটু হেসে চুপ করে গেল ললিত। গাইড ক্ষুণ্ণ মনে অমর সিংহের গেটের দিকে বড় বড় পা ফেলে চললো।

আরো জনকতক নরনারী দুর্গ দেখবার জন্যে এসেছে; তাদের মধ্যে একটি বাঙ্গালী পরিবারও রয়েছে। বাঙ্গালীর মুখ দেখলেই ললিতের সব মনে পড়ে, আশঙ্কায় তালু শুকিয়ে আসে। সবাইকে পাশ কাটিয়ে সে ভেতরে ঢুকে গেল; স্যাঁৎসেতে অন্ধকার রাস্তার দু-পাশে পাষাণ কক্ষ থেকে কেমন যেন একটা পরিচিত গন্ধ ভেসে এলো তার নাকে, মনে পড়লো, মিত্তির বাড়ির সদর দরজার দুপাশের রোয়াক: দিদির কাতর চিৎকার: ওটা লম্পট! ওটা লম্পট! তারপর জনবহুল রাস্তা, সুরেশ ডাক্তারের ডিসপেনসারি, উন্মত্তভাবে সুরেশকে আক্রমণ, সুরেশের অসাড় দেহ মেজেতে লুটিয়ে পড়া।

ঘনঘন নিঃশ্বাস পড়তে লাগলো ললিতের। গাইড ছোকরা একটু হেসে বললে, এই সামান্য সিঁড়ি উঠতেই হাঁপাচ্ছেন বাবুজী, এখনও যে অনেক বাকী।

উদ্‌গত নিঃশ্বাসটা চেপে চাইল সে গাইডের দিকে।

জাহাঙ্গীর মহলে যাবেন? বললে গাইড।

চলো।

জাহাঙ্গীর মহল: বিরাট লাল পাথরে গড়া ভারতীয় স্থাপত্যের নিদর্শন। ললিত লক্ষ্য করলে মুসলমানী স্থাপত্যের সঙ্গে হিন্দু কারু-শিল্পের সার্থক শিল্পমিলন। পাথরের বুকে স্বর্ণাঙ্কিত চিত্রগুলির বেশির ভাগই আগুনে ঝলসানো। গাইড সেই দিকে চেয়ে বললে, জাঠরা ওগুলো নষ্ট করে দিয়েছে।

ইতিহাসের কতকগুলো পাতা উল্টে গেল ললিতের মনে, শুধু জাঠ নয় স্বয়ং ঔরঙ্গজেবও এই ধ্বংসযজ্ঞের পুরোহিত হয়েছিলেন

ললিতের মাথাটা বোঁ করে ঘুরে গেল ; খাসমহল শিস্‌মহল কোথায় গুলিয়ে যাচ্ছে, মনে পড়লো একটা বিকৃত মুখ হাওয়া গিলতে চাইছে। সে তাড়াতাড়ি বললে, চলো ওপরে।

ওপরে গিয়ে গাইড গল্প শুরু করলে, ললিত শান্ত হয়ে এলো। জানেন বাবু অন্দর মহলের পাশে এ রকম জায়গা, শুধু গুপ্তহত্যার জন্যে ; বোধ হয় দরবারে যাদের বিচার করা চলবে না তাদের ফাঁসি এখানে হতো, তা ছাড়া বাঁদীদের শাস্তি বেগমরা নিজেরাই দিতেন কিনা।

ললিতের মনে হলো শুধু বাঁদী কেন ? বহু হতভাগ্য বান্দার বলিষ্ঠ অসাড় দেহ এই কূপের মধ্য দিয়ে যমুনার স্রোতে ভেসে গেছে ; এই পাষাণের আড়ালে কত করুণ কাহিনী, কত বিয়োগান্ত নাটকের শেষ অঙ্ক অভিনীত হয়ে গেছে। একটা দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে এলো তার মুখ দিয়ে, ভেসে উঠলো দৃশ্যের পর দৃশ্য,—প্রশস্ত বক্ষ উন্নত ললাট মুসলমান যুবক, কোমরে বাঁধা বাঁকা শমশের, মাথায় অভিজাত আনামা, এসে নামলো প্রাসাদ দ্বারে তার চঞ্চল শ্বেত অশ্ব থেকে, বিজয়ীর হাসি নিয়ে প্রবেশ করলো ভেতরে, কিন্তু আর ফিরলো না। তার নিস্পন্দ দেহ ভেসে গেল যমুনার স্রোতে।

সুচতুর সরকারী আদেশে চারিদিকে লোক ছুটলো সন্ধানে, ফিরে এলো নত মস্তকে। প্রাসাদদ্বারে শ্বেত অশ্ব প্রভুর প্রতীক্ষায় মাটির বুকে খুরের আঘাত করতে করতে ক্লান্ত হয়ে পড়লো।

পারস্য থেকে ধরে আনা তপ্ত-কাঞ্চন বর্ণের যুবতী বাঁদী, চোখে বিদ্যুৎ, দেহে সংজ্ঞাহীন আকর্ষণী। বিজয়িনীর গর্বিত মরাল গ্রীবায় এসে পড়লো নিষ্ঠুর কঠিন রজ্জু, একটা নিরর্থক আর্তনাদ, তারপর যমুনার কোলে আশ্রয়। বাদ্‌শার ব্যাকুল প্রশ্ন, কোথায় সে গেল, নিয়ে এসো তাকে। সারা মহলে সন্ধান মিললো না ; বেগম হেসে উত্তর দিলেন, সে বোধ হয় ওই কোনো বান্দার সঙ্গে

অনেকে অনেককিছু কল্পনার খোরাক যোগাচ্ছেন ; তবে নিবারণ জানা জোর গলায় প্রচার করেন, এটা নাকি একজন সিদ্ধ-পুরুষের মাদুলি ধারণে সম্ভব হয়েছে, মোটের ওপর তাঁদের দাম্পত্য জীবনে শান্তি এনে দিয়েছে এই সম্ভাবনা।

বাড়ির পেছন দিকের গাড়োয়ানদের খবর এবাড়ির বাসিন্দাদের কাছে অপ্রায়োজনীয় হলেও মাঝে মাঝে একটি রমণীর আর্ত ক্রন্দনে বাসিন্দাদের অনেকেই চঞ্চল হয়ে ওঠেন। এই গাড়োয়ান-রমণীর একমাত্র সন্তান নাকি হাওড়ায় গাড়োয়ানদের হাঙ্গামায় পুলিশের গুলিতে নিহত হয়েছে।

রামকালীবাবুর চেহারার মধ্যে কিছু পরিবর্তন এসেছে, গড়গড়ার নল হাতে বৈঠকখানায় বসে থাকার সময়ও আজকাল বেড়ে গেছে। অমিয়কান্তি কিছুদিন হলো জেল থেকে ছাড়া পেয়েছে, আজ তাকে পাঠিয়েছেন পুনরায় কলেজে ভর্তি হবার জন্যে। অমিয় আবার কলেজে ভর্তি হলে তিনি কতকটা নিশ্চিন্ত হন।

মাথা নিচু করে বৈঠকখানা ঘরে এসে ঢুকলো অমিয়কান্তি, তাকে দেখে জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে চাইলেন রামকালীবাবু।

কলেজে ভর্তি হওয়া গেল না বাবা !—বললে অমিয়কান্তি।

কেন ?—গম্ভীরভাবে বললেন রামকালীবাবু।

কলেজ কর্তৃপক্ষ রাজী নয় জেল ফেরৎ ছেলেদের ভর্তি করতে !

অন্য কলেজে চেষ্টা করো !

এরা আবার কিরকম সার্টিফিকেট দেন !—অমিয়কান্তি চিন্তিতভাবে বললে।

রামকালীবাবু স্বভাবসুলভ জলদগম্ভীর গলায় শুরু করলেন, হু ! কি লাভ হলো তোমার ? নিজের ভবিষ্যৎ খুইয়ে কি বা করতে পারলে ? সেইতো আবার গভর্ণমেণ্টের সঙ্গে মিটমাট করতে হবে, তারপর যে যার বাগিয়ে নেবে, আর তোমরা মূর্খ ছেলের দল লেখাপড়া,

ভবিষ্যৎ খুইয়ে ফ্যা ফ্যা করে ঘুরে বেড়াবে, কেউ একবার মুখ তুলে চাইবেও না তোমাদের দিকে !

উত্তর দেবার ইচ্ছা হলো না অমিয়কান্তির, চুপ করে বসে রইল মাটির দিকে চেয়ে। কলেজ কর্তৃপক্ষের ব্যবহারে নিজেকে আজ সত্যি অপমানিত মনে হচ্ছে।

এখন যা ভাল বোঝ করো, আমি আর কি বলবো। নিজের মূর্খামির শাস্তি পাওয়া চাই !—ক্ষোভের সঙ্গে বললেন রামকালীবাবু।

অমিয়কান্তি অপরাধীর মত নিঃশব্দে উঠে চলে গেল।

বাড়ির সবাইকে এড়িয়ে অমিয়কান্তি গিয়ে দাঁড়ালো দোতলার বারান্দায়। তার মাথার মধ্যে নানা কথা ঘুরে বেড়াচ্ছে, গান্ধীজি মিটমাটের শর্ত দিয়েছেন বড়লাটকে, সংগ্রাম কি সত্যই শেষ হতে চললো ? কলেজের ছেলেদের মধ্যে উৎসাহহীন ঢিলেমি। একটা অস্বাভাবিক নির্লিপ্ততা ! সন্ধি যে সাময়িক এ কথা তো কারুই মনের মধ্যে আছে বলে মনে হচ্ছে না।

বাবা অমিয় ! অমিতাভর কোন খবর জানো ?—পাশের বারান্দা থেকে জিজ্ঞেস করলেন মৃন্ময়ী দেবী।

আর কি মাসিমা, এবারে অমিতাভ ছাড়া পেয়ে যাবে, আপনার শরীর অসুস্থ বলে মনে হচ্ছে ?

আমার আবার শরীর, ও কিছু নয় বাবা। মিটমাট কি সত্যি হবে ?

সেইরকমই মনে হচ্ছে। চিন্তিতভাবে বললে অমিয়কান্তি।

হলেই ভাল, তবে উনি বলছিলেন কংগ্রেসের সবাই নাকি রাজি নন মিটমাটে ! আমি আসছি বাবা, খুকীটা আবার কাঁদছে, দেখি কি হলো।

মৃন্ময়ী দেবী চলে গেলেন ভেতরদিকে। অমিয়কান্তি রেলিং ধরে দাঁড়িয়ে রইল। ভবিষ্যৎ যেন ঝাপসা হয়ে আসছে। সে আর কত হাতড়াবে !

॥ ৬ ॥

মেদিনীপুর জেল হাসপাতাল। খাটিয়ার কাছে দাঁড়িয়ে একজন কয়েদী তদবিরকার ডাকলে, উঠুন বাবু অনেক বেলা হয়ে গেছে।

চোখ মুছে আড ভেঙ্গে উঠে বসলো অমিতাভ। আজ তার শরীরটা বেশ ঝরঝরে লাগছে আজ ফিরতে পারবে ওয়ার্ডে। সঙ্গীদের ছেড়ে এই সাত আট দিন হাসপাতালে থাকা তার বিরক্তিকর লাগছে। হাই তুলে খাটিয়া থেকে নামতে নামতে বললে সে, রতন আমি তো আজ যাচ্ছি সাত নম্বরে।

ভালই তো বাবু হাসপাতাল কি থাকার জায়গা ?

আচ্ছা রতন আর কতদিন পরে তুমি বাড়ি যাবে ?

কথাটায় রতন যেন একটু খুশি হয়ে উঠলো সে বললে হিসাব করে, তা প্রায় শেষ করে এনেছি আর বছর সাত পরেই ছুটি পাবো।

অবাক হয়ে চাইল অমিতাভ তার দিকে। সে আবার বললে, মোটামুটি আঠারো বছরের মধ্যে বছর তিনেক রেমিশন পাবো বাবু।

কি করেছিলে ?

ডাকাতি করেছিলুম বাবু খুন করার ইচ্ছে ছিল না হয়ে পড়লো।

তোমাদের কষ্ট হয় না এখানে এতদিন থাকতে ?

হয় বইকি বাবু কিন্তু উপায় কি, তবে চোরেদের কষ্ট আমাদের চেয়ে বেশি হয়। টাকার জোরে আমরা কিছুটা সুবিধা করে নি।

তাই নাকি এখানেও টাকা ?

তা ছাড়া কি। থাক বাবু সে সব কথা, মুখটা ধুয়ে নেবেন চলুন।

বারান্দায় বেরিয়ে অমিতাভ দাঁতন করতে শুরু করলে। রতন তাকে রোজ একটা টাটকা নিমের দাঁতন জোগাড় করে এনে দেয়। সে বললে, যেন শুনছিলাম বাবু আপনারা আজ ছাড়া পাবেন।

না তেমন কিছু না।

ভেতরে চলো তোমার মা দাঁড়িয়ে আছেন।

রান্নাঘরের সামনে মাকে প্রণাম করে দাঁড়ালো অমিতাভ, তাঁর মুখের দিকে না চেয়েই। তিনি ফোঁপাতে ফোঁপাতে জড়িয়ে ধরলেন তাকে। নিজের অজ্ঞাতে অমিতাভর চোখ থেকে জল গড়িয়ে পড়লো, হারাধনবাবু চলে গেলেন সেখান থেকে।

মৃন্ময়ী দেবীর এতদিনের জমাট কান্না যেন তুষারের মত গলতে শুরু করেছে; অনেক কষ্টে নিজেকে সামলে নিয়ে তিনি বললেন, তোরা ঘরে বসগে আমি চা আনছি।

তিনি তাড়াতাড়ি ঢুকে পড়লেন রান্নাঘরে; অমিতাভ এগিয়ে ঢুকলো নিজের ঘরে।

দেড় বছরের মধ্যে তার নিজের ঘরের কোন পরিবর্তন চোখে পড়লো না। যেমন অবস্থায় রেখে সে চলে গিয়েছিলো সেই অবস্থাতেই আছে। এমনকি বইগুলো যেমনভাবে ছড়ানো ছিলো টেবিলে, সেগুলো সেইভাবেই রয়েছে। তার অতি প্রিয় পুরানো চটিটা একই জায়গায় মেজেতে পড়ে আছে। কিন্তু কোথাও ধুলোর চিহ্ন নেই। কে যেন নিপুণ হাতে সব ঝেড়ে-পুঁছে রেখেছে। আরামের নিঃশ্বাস ছেড়ে সে একেবারে বিছানায় চিৎ হয়ে পড়লো। অমিয়কান্তি তার পাশে বসে দুষ্টুমিভরা গলায় বললে, ঠিক হয়েছে যেমন চেহারার গর্ব ছিলো, সেটা চূর্ণ হয়েছে। নিজের মুখখানা অনেকদিন বোধ হয় দেখিসনি? দেখলে মূর্চ্ছা যাবি।

নিয়ে আয় তো আয়নাটা, আজ দেড় বছর মুখটা দেখিনি।

দেয়াল থেকে আয়নাটা, পেড়ে তার হাতে দিয়ে বললে অমিয়কান্তি, এই নে দেখ আমি স্মেলিং সল্ট-এর শিশিটা খুঁজে রাখি।

নিজের চেহারা দেখে অমিতাভ যেন দুর্বল হয়ে পড়লো; হাতটা

তুলে আয়নাটা ফেরৎ দিতেও যেন তার ক্লান্তি লাগছে। অমিয়কান্তি হেসে বললে, জানিস মিনটু আমিও জেল খেটে এসেছি।

কি বললি জেল খেটে এসেছিস?

আজ্ঞে হ্যাঁ বীরপুরুষ। তার কথা শেষ হবার পূর্বেই অমিতাভ তাকে জড়িয়ে ধরলে, টাল সামলাতে না পেরে অমিয়কান্তি গড়িয়ে পড়লো বিছানায়: ঠিক সেই সময় মৃন্ময়ী দেবী ঘরে ঢুকে বললেন, স্নান করা নেই, কাপড় ছাড়া নেই, দুজনে বিছানায় গড়াতে শুরু করেছিস। নে ওঠ চা খেয়ে নে।

দুজনে উঠে হাসতে হাসতে চায়ের কাপ তুলে নিলে। মৃন্ময়ী দেবী বলে গেলেন, চা খাওয়া সেরে স্নান করতে যাবে মিনটু।

চা খাওয়া শেষ হতে অমিয়কান্তি উঠে দাঁড়িয়ে বললে, তুই যা স্নান করতে, আমি এখন যাই পরে আসবো।

সে চলে গেল; অমিতাভ এগোলো কলতলার দিকে।

কলতলায় সবগুলো বালতিতে গরম জল ঠাণ্ডা জল মিশিয়ে রাখা হয়েছে; সে গিয়ে বসলো একটা টুলে। মৃন্ময়ী দেবী কাপড় সেঁটে একটা গামছা হাতে এসে বললেন, বসদিকি তোর পিটটিট্‌গুলো ঘসে দি, গায়ে যেন এক ইঞ্চি ময়লা বসে আছে।

ব্যাপার বুঝতে পেরে হতাশভাবে চাইল অমিতাভ; তার মুখের চেহারা দেখে ছোট বোনটা বলে উঠলো, দেখো মা, দাদা আমার মত রেগে যাচ্ছে চান করতে।

আসলে অমিতাভর রাগ মোটেই হয়নি, ছোট বোনটার সামনে বুড়ো বয়সে মায়ের সেবা নেওয়ার সঙ্কোচ কাটাতে পারছে না। গা, মাথা, পিঠ, এমন কি কানের গোড়া পর্যন্ত সাবান দিয়ে ঘসতে ঘসতে বললেন মৃন্ময়ী দেবী ক্ষুব্ধ 'সুরে, পিঠে এতো বেতের দাগ।

কোন উত্তর না দিয়ে চোখ বুজে বসে রইল অমিতাভ। রাজ্যের ঘুম যেন তার দু চোখে নেমে এসেছে।

করে উঠলো, ভকৎ সিং জিন্দাবাদ ; হিন্দুস্থান সোসালিষ্ট রিপাব্লিকান আর্মি জিন্দাবাদ। ছেলেদের সঙ্গে দোকানদারদের কথা কাটাকাটি হলো সামান্য—ছেলেরা আবার জয়ধ্বনি করে তাড়াতাড়ি অদৃশ্য হয়ে গেলো সরু গলির মধ্যে। ললিত ব্যাপারটা ঠাওর করতে না পেরে পা চালিয়ে দিলে গন্তব্যস্থানের দিকে। সে আশ্চর্য হয়ে লক্ষ্য করলে রাস্তায় যে-কটা দোকান খোলা সবগুলোই মুসলমানদের ; হিন্দুর দোকান হিসাবে ছবির দোকান যদি বন্ধ থাকে তা হলে সে যে বড় মুস্কিলে পড়বে।

নিজের গন্তব্যস্থানে পৌঁছে ললিত দেখলে যা ভয় করেছিল তাই, ছবির দোকানটা তালাবন্ধ। নিরাশ হয়ে ফিরতে যাচ্ছিলো, পেছন থেকে স্থানীয় ভাষায় ডাক শুনতে পেলে, অনিলবাবু খবর কি ? কিছু দরকার আছে ?

ঘুরে দাঁড়িয়ে ললিত দেখলে তার পরিচিত দোকানদার দোকানের পেছনে দাঁড়িয়ে। সে ফিরে চললো সেই দিকে। তার কাছাকাছি এসে ললিত বললে, আপনার অর্ডারি ছবিটা এনেছি।

কই দেখি—ছবিখানা হাতে নিয়ে দেখতে দেখতে দোকানদারের মুখে প্রশংসার ভাব ফুটে উঠছিলো, সে সেটা সংযত করে নিয়ে বললে, আজ যে হরতাল।

চিন্তিতভাবে জিজ্ঞেস করলে ললিত, কিসের হরতাল ?

কেন জানেন না আপনি ? ভকৎ সিং-এর ফাঁসি হয়েছে।

কিন্তু কতকগুলো দোকান খোলা রয়েছে ?

মুসলমানরা হরতালে যোগ দেয়নি।

আজ যদি ছবির টাকাটা দেন বড় উপকার হয়। সঙ্কোচের সঙ্গে বললে ললিত।

তাইতো বাবু দোকান তো আজ খোলা চলবে না, আচ্ছা কিছু টাকা পকেট থেকে আপনাকে দিচ্ছি।

করতে পারে এ-কথা কে কবে কল্পনা করেছিল। সে বেদনাতুর গলায় বললে, আচ্ছা মা ললিত কি সত্যিই সুরেশ ডাক্তারকে খুন করেছে।

কি জানি বাপু।

মালতীদি কি বলে?

ও আবার কি বলবে? আমার কিন্তু ভাল লাগতো না ওই সুরেশ ডাক্তারের আসা যাওয়া। অত কথা তোর জেনে দরকার নেই—যা তাড়াতাড়ি খবরটা নিয়ে আয়।

মা কথাটা চেপে যাচ্ছেন দেখে প্রশ্ন না করে অমিতাভ উঠে চলে গেল।

উঠোন পেরিয়ে মালতীদের দরজা দিয়ে ঢুকে পড়তেই অমিতাভর কানে এলো কর্কশ কণ্ঠে মালতী কাকে বলছে—আপনি চলে যান বলছি চলে যান। পরক্ষণেই একটা বেহায়ার মত কণ্ঠস্বর শুনতে পেলে, আহা রাগ করো কেন গো, আমি না হয় যাচ্ছি, টাকাটা তুমি নাও লক্ষ্মীটি। তারপর চিৎকার করে উঠলো মালতী, ও টাকা চাই না, আমি উপোস করে মরবো, আপনি বেরিয়ে যান বলছি নয়তো লোক ডাকবো। ভেতর থেকে পদশব্দ শুনে অমিতাভ দরজার আড়ালে গিয়ে দাঁড়ালো; ব্রজেন্দ্রনাথ অস্ফুটকণ্ঠে কি সব বলতে বলতে বেরিয়ে গেলেন। সে ভেতরে চলে গেল।

তাকে দেখে প্রায় পাগলের মত চিৎকার করে উঠলো মালতী, তুই আবার কি করতে এলি, চলে যা আমার জন্যে ভাবতে হবে না।

থতমত খেয়ে অমিতাভ বললে আস্তে আস্তে, মা, মা পাঠালেন মেশোমশায় কেমন আছেন জানতে।

মালতী প্রায় আপন মনে বললে, ডাক্তারেরা বলেছেন কোন আশা নেই।

এরপর কি কথা বলবে খুঁজে না পেয়ে অমিতাভ মাথা হেঁট করে দাঁড়ালো। মালতী কাছে এসে তার গালে কাল বেতের দাগ

দুর্বল করে দিতে চায়, আমরা তা হতে দেব না, সুবিধাবাদী নেতৃত্বের স্বরূপ প্রকাশ করবো।

এখানেও নেতৃত্বের দ্বন্দ্ব ?

উপায় কি ভাই, প্রথমেই সাবধান হওয়া ভাল। আমাদের আন্দোলন শৈশব অবস্থায়, মুখে রক্ত তুলে নিজেদের সঙ্ঘ গড়ে তুলেছি তা কি বিশ্বাসঘাতক নেতৃত্বের হাতে তুলে দেবার জন্যে ?

বিচারে তোমাদের ভুল হতে পারে তো ?

ভুল যদি হয় তার মধ্যে শ্রমিকরা অভিজ্ঞতা লাভ করবে, নিজেদের শক্তির পরিচয় পাবে, নির্ভুল জড়ত্বের চেয়ে সেটা লক্ষগুণে ভাল। কথা শেষ করে সুরেন খেতে বসে গেল।

অমিতাভ একটু চুপ করে থেকে বললে, আমি একাই যাবো, তোমাদের আন্দোলনের সঙ্গে পরিচিত হতে আমার বড় ইচ্ছে করছে।

যেও ভাই, গেলে আমরা খুশিই হবো, কিন্তু আমাদের ব্যবহার হয়তো তোমার ভদ্ররুচিতে বাধবে। শুধু এইটুকু অনুরোধ, আমরা শ্রমিক, আমাদের সঙ্গে তোমাদের স্বভাবের যে অনেক পার্থক্য আছে সেটা স্মরণ রেখো।

সুরেনদা তুমি নিজেকে শ্রমিক ভাবো কি করে ?

সুরেন একটু নড়ে চড়ে বসে একটু জল খেয়ে শুরু করলে, কাজের মধ্যে দিয়ে যে-কেউ শ্রমিক শ্রেণীতে আসতে পারে, তবে আমার তা দরকার হয়নি। আজকের এই সামান্য অবস্থার উন্নতি দেখে তোমার সন্দেহ হতে পারে মিনটু। আসলে আমি একজন সাধারণ ক্লিনার ছিলুম, চেষ্টা করে কোনরকমে ফিটার হয়েছি, ভবিষ্যতে হয়তো ইন্‌জিনিয়রও হতে পারতুম সুযোগ পেলে ; এই শ্রমিক সঙ্ঘের দৌলতে লেখাপড়া শিখেছি, দুনিয়াকে দেখতে শিখেছি, নিজেদের অবস্থা বুঝতে শিখেছি। বালক সুরেন সিংহকে দেখলে তোমরা হয়তো চোখ ঘুরিয়ে নিতে—আজকে তোমার সঙ্গে কথা

একজন এগিয়ে যেতে যেতে বলছে, ভাই সব আমার সঙ্গে এসো। এর কৈফিয়ৎ চাই। এর বিচার চাই।

হুড়মুড় করে দলে দলে শ্রমিক ছুটে চললো এলবার্ট হলের দিকে। সুরেন আপ্রাণ চিৎকার করে বললে, বন্ধুগণ থামো, আগে ভেবে নাও।

সহস্রকণ্ঠের জিন্দাবাদধ্বনিতে তার কণ্ঠস্বর মিলিয়ে গেল। পেছনে পেছনে সেও ছুটে চললো।

হলের সামনে দরজার গোড়ায় পেশোয়ারীগুলো এত লোক দেখে সরে পড়লো দরজা ছেড়ে। ঠিক সেই সময় দ্বিধাগ্রস্থ অমিতাভ ভিড়ের চাপে ভেতরে ঢুকে গেল। ক্রুদ্ধ, উত্তেজিত, ঘর্মাক্ত মজুরদের মুখের দিকে সে অবাক বিস্ময়ে চেয়ে রইল। অনেক চেষ্টা করেও সে এখানে না এসে থাকতে পারেনি। সুরেনদার নিষেধই যেন তাকে চুম্বকের মত টেনে নিয়ে এলো।

ইনক্লাব জিন্দাবাদ। গান্ধীবাদ বরখলাপ, মজদুর কিসান জিন্দাবাদ—সহস্রকণ্ঠের বীরদর্পে বুঝি হলের ভিৎ কেঁপে যাবে।

বন্যার মত মজুররা হলের মধ্যে ঢুকে পড়লো; তাদের আওয়াজে পদভরে কেঁপে উঠলো কাউন্সিল বৈঠক। দেখতে দেখতে সভাপতির আসন শূন্য হয়ে গেল: নতমস্তকে একদল নেতৃস্থানীয় লোক হলের পেছন দিকের দরজা দিয়ে অদৃশ্য হয়ে গেলেন।

রুক্ষ চেহারার একজন শ্রমিকনেতা টেবিলের ওপর লাফিয়ে উঠে হাতের ঝাঁকুনি দিয়ে বক্তৃতা শুরু করলেন; সহ-সভাপতি কমরেড মুখার্জির নাম সভাপতি হিসাবে প্রস্তাব করা হলো। শুরু হলো নিয়মিত সাধারণ অধিবেশন। পূর্বসভাপতির ওপর অনাস্থা জ্ঞাপন করা হলো সমবেতভাবে।

এসব যেন হেঁয়ালি ঠেকছে অমিতাভর কাছে; সুরেনদা ঠিকই

বলেছিল, তুমি বুঝবেনা আমাদের—ভাবলে সে। অধিবেশন শেষে মজুরদের মুখের দিকে চাইতে চাইতে হল থেকে বেরিয়ে গেল; মজুররা যেন যুদ্ধ জয় করে ফিরছে!

সিঁড়ি দিয়ে নেমে রাস্তায় দাঁড়াতেই একটা বলিষ্ঠ হাত তার কাঁধে চাপলো, উৎফুল্ল কণ্ঠস্বর শুনতে পেল সে, তুমি যে আসবে না বলেছিলে মিনটু?

না এসে পারলুম না সুরেনদা, ক্লান্তভাবে উত্তর দিলে সে।

কেমন দেখলে?

ভাল বুঝতে পারলুম না, তোমরা জয়ী হয়েছো?

জয় অবশ্য আমাদেরই, কিন্তু এই অনৈক্যের কুফল কিছুদিন ভোগ করতে হবে শ্রমিকদের; অন্য উপায় অবশ্য ছিল না! চিন্তিতভাবে সুরেন বললে অমিতাভকে টেনে নিয়ে যেতে যেতে।

আচ্ছা সুরেনদা তোমাদের ধ্বনির মধ্যে জাতীয়তাবাদী নেতাদের অশ্রদ্ধা করা হয়, এর ফল কি ভাল?

সুরেন কোন উত্তর না দিয়ে হাসলে, এ-নিয়ে কথা না তোলাই এখন ভাল, কারণ আমরা দুজনেই ক্লান্ত, চলো ওই ট্রামটায় উঠে পড়ি।

একটু হেসে বললে অমিতাভ, খালি পা না হলে বুঝি বিপ্লব করা যায় না সুরেনদা?

না না আজ তাড়াতাড়ি জুতো পরতে ভুলে গেছি! লজ্জিত ভাবে বললে সুরেন।

যতদূর সম্ভব চেষ্টা করবো।

আচ্ছা আমি কাল সকালে খবর নেব, এখন যাই।

অমিতাভ চলে যাবার পর সুরেন ষ্টোভ জ্বেলে রান্না করতে ব্যস্ত হয়ে পড়লো।

একঘণ্টার মধ্যে সে একটা থালায় গরম ভাতে দুধ আর চিনি মিশিয়ে মালতীর দরজাটা খুলে ফেললে। নিঃশব্দে থালাটা নামিয়ে রেখে আদেশের সুরে বললে, উঠুন এগুলো খেয়ে নিন।

অপরিচিত কণ্ঠস্বরে ত্রস্ত মালতী সোজা হয়ে উঠে বসলো, শরীরের কাপড়টা গুছিয়ে নিয়ে অগ্নিদৃষ্টিতে চাইলো সে।

কঠিনভাবে বললে সুরেন, খেয়ে নিন, ঢের হয়েছে।

তার মুখের দিকে চেয়ে কেমন যেন ভয় হলো মালতীর। সে তাড়াতাড়ি চোখ ফিরিয়ে নিলে, চোখে পড়লো দুধমাখা গরম ভাত, তখনও ভাপ উঠছে ; মিষ্টিগন্ধে ভরে গেছে ঘরটা। তার পেটের মধ্যে একটা মোচড় দিয়ে উঠলো।

দেরী করছেন কেন, খেতে বসুন।

আস্তে আস্তে এগিয়ে গেল মালতী থালার দিকে ; সুরেন একটা আরামের নিঃশ্বাস ফেললে ; মালতী চেঁচিয়ে উঠলো, কে তুমি ? আমার ঘরে কেন ঢুকলে ?

বেশি চেঁচামেচি করলে ভাল হবে না বলছি—সাবধান ! ধমকের সুরে চোখ পাকিয়ে বলতে বলতে এগিয়ে গেল সুরেন মালতীর দিকে। নিস্তব্ধ রাত্রির অন্ধকারে মালতার গা ছম্‌ছম্ করে উঠলো, সে একমুঠো ভাত তুলে নিয়ে গিলে ফেললে তাড়াতাড়ি।

সুরেন দূরে সরে দাঁড়ালো, মালতী নতমস্তকে খেয়ে চললো ; সুরেনের কথা বলার ধরন মালতীর কাছে সম্পূর্ণ নূতন ! খোসামুদীর রেশ নেই, আছে বজ্রকঠোর আদেশ ; চোখের দিকে চাইলে বুক কেঁপে ওঠে। লোকটা যেন কি !

খাওয়া শেষ হতে একঘটি জল এনে নামিয়ে দিয়ে বললে সুরেন, আমি এখন যাচ্ছি,—এই পাশের ঘরেই থাকি। দরকার হলে ডাকবেন, কোন দ্বিধা করবেন না।

ব্যবহারে কণ্ঠস্বরে বিস্মিত মালতী চাইল সুরেনকে দেখবার জন্যে, দরজাটা বন্ধ হয়ে গেল সশব্দে ; সে টলতে টলতে গিয়ে ভেতর দিকের শেকলটা লাগিয়ে দিয়ে হাঁপাতে লাগলো।

আজ দুটো থালা যে ?

কাজ আমার বাড়িয়ে দিয়েছো, একটি তোমার দিদিকে দিয়ে এসো।

আমার একা যেতে ভরসা হয় না।

বেশ তুমি দরজাটা খোলাও, আমি থালাটা বয়ে দিয়ে আসবো।

তুমি একাই যাও না সুরেনদা।

না একা যাবো না, আমাকে আর ফাঁসিও না ভাই, যা তোমাদের ছোটকর্তা আছেন।

কথাটার মানে বুঝে অমিতাভ হেসে বেরিয়ে গেল; সুরেন কান পেতে রইল পাশের দরজার দিকে।

একটু পরেই মালতী অমিতাভর কথাবার্তা শোনা গেল।

কাল একটা বদলোককে কেন আমার ঘরে এনেছিলি মিনটু ?

বদলোক কেন হবে ?

নয়তো কি ? আমাকে যেন মারতে এলো রাতে।

যাক। এখন তোমাকে খেতে হবে।

কি খাবো ?

ব্যবস্থা করেছি। কথার শেষে চট করে সুরেনের ঘরের শেকলটা খুলে দিলে।

মালতী সেই দিকে চাইতেই দেখলে একহাতে থালা নিয়ে ঘরে এসে ঢুকলো রাত্রের লোকটা, পেশীবহুল দেহ, কোমরে একটা কাপড় জড়ানো। তার মন্তব্য হয়তো শুনতে পেয়েছে ভেবে মালতী লজ্জিত হয়ে মাথা নিচু করলে।

সুরেন থালাটা সামনে নামিয়ে সোজা চেয়ে বললে, নিন, আমাদের কৃতার্থ করুন আজকের মত। মানুষ হয়ে জন্মেছেন অথচ সে-জন্মের মর্যাদা রাখতে শেখেননি। আত্মহত্যায় বাহাদুরি নেই।

আমি খাব না, আমি খাব না। কান্নায় ভেঙ্গে পড়লো মালতী।

তাই নাকি ?—হাসি মুখে বললেন ছোটগিন্নি, মনে হলো তার মুখের ওপর থেকে একটা দুশ্চিন্তার মেঘ কেটে গেল।

তোমাকে আর আমি চিনতেই পারবো না, দাঁড়াও না, বি-এটা পাশ করতে দাও।—খিলখিল করে হেসে উঠলো রুনু।

ওই মতলবই হচ্ছে পোড়ারমুখী। রুনুর গালে একটা মৃদু আঘাত করলেন তিনি।

যাই মা অমিদাকে খবরটা দিয়ে আসি—প্রায় ছুটে বেরিয়ে গেল রুনু ; খুশি মনে তার গতির দিকে চেয়ে ভাবলেন ছোটগিন্নি,—এ মেয়ের মুখে হাসি ফুটবে একথা কে কবে ভেবেছিল।

ঘর থেকে বেরিয়ে রুনু সোজা উঠে গেল ছাদে অমিয়কান্তির সন্ধানে ; তার জানা আছে এই সময় অমিতাভ আর অমিদা ছাদের পশ্চিম কোণটায় বসে গল্প করে।

ছাদের কোণে দাঁড়িয়ে অমিতাভ একা। অমিয়কান্তিকে দেখতে পেলো না রুনু। যাওয়া না যাওয়ার নীরব দ্বন্দ্বের মধ্যে রুনু ধীরে এগিয়ে গেল অমিতাভর দিকে। নির্নিমেষ দৃষ্টিতে অমিতাভ তখন গঙ্গার দিকে চেয়ে কি যেন ভাবছে। রুনু যে এসে পাশে দাঁড়িয়েছে সে দিকে খেয়াল নেই। আকাশভরা সিন্দুরে মেঘের রাজ্যে একটা বেদনাতুর সন্ধ্যাকে অবচেতন থেকে চেতনায় ঠেলে দিচ্ছে। মধুর কম্পিত কণ্ঠস্বরে চমকে উঠলো সে।

অমিতাভ কি ভাবছো ?

কিছু না কিছু না। কণ্ঠস্বর যেন ধরা পড়ে যাওয়ার সঙ্কোচে ভরা।

রুনু তার ডান হাতখানা তুলে নিয়ে বললে, আমি কলেজে পড়বো, বাবার বাধা টিকলো না অমিতাভ।

অমিতাভ ফিরে চাইল। তার বিষাদাচ্ছন্ন মুখের দিকে চেয়ে বললে রুনু, এতে তুমি সুখী হয়েছো ?

সপ্তম সর্গ

স্বেচ্ছাসেবক সংগ্রহ করতে বেরিয়ে অমিতাভ নিশিকান্তবাবুর অংশটার সামনে দাঁড়ালো ; ছেলেদের বসবার ঘরে তখন প্রচণ্ড আড্ডা জমে উঠেছে। এ সময় যাওয়া উচিত কিনা ভাবতে ভাবতে ঢুকে পড়লো অমিতাভ ঘরটার মধ্যে। সুজিৎ ঘোষের সেই ভাঙ্গা ঘরটার চেহারা পালটে গেছে। সৌখীনভাবে সাজানো ঘরে ততোধিক সৌখীন পোশাক পরা ছেলেরা বসে। তাকে দেখে নিশিকান্তবাবুর বড়ছেলে সুখেন্দু এগিয়ে এসে বললে, এসো এসো অমিতাভ—আজ পথ ভুলে নাকি ?

মৃদু হেসে চাইল অমিতাভ সবার দিকে। তাকে মাঝখানের একটা সোফায় বসিয়ে সুখেন্দু বললে, তোমার সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দি —ইনি বিমল বোস, সাহিত্যিক কবি কলেজের জুয়েল ; এর নাম মৃগাঙ্ক পালিত, দক্ষিণ পাড়ার দারুণ সরেস বনেদী, বর্তমানে জার্ণালিজম্ করছেন ; এই অমল সোম, কলেজের ভাল ডিবেটার, আইন অমান্য আন্দোলনে জেল খেটে এসে এখন মার্কসিজম চর্চা করছেন আর ওদের তো তুমি চেনো, আমার ভাই নবেন্দু অমলেন্দু। ফিরে বললে—ইনি অমিতাভ রায়, আমাদের এই বাড়ির বাসিন্দা, কংগ্রেসভক্ত দেশসেবক।

নমস্কারের পালা শেষ করে অমিতাভ চাইল হাসিমুখে।

অমল সোম তার দিকে চেয়ে বললে, মিষ্টার রায়, আবার তো ঘনিয়ে এসেছে, দু-একদিনের মধ্যে আন্দোলন শুরু হবে, কি করবেন ঠিক করলেন ?

প্রসঙ্গটা উঠেছে দেখে খুশি হয়ে বললে অমিতাভ, যোগ দেবো আন্দোলনে, সঙ্গে সঙ্গে আপনাদেরও যোগ দিতে বলবো।

আমিও যোগ দেবো ঠিক করেছি কিন্তু এঁরা বাধা দিচ্ছেন।

কেন ? হেসে বললে অমিতাভ।

অমল সোমকে থামিয়ে দিয়ে সুখেন্দু উত্তর দিলে, কারণ এ

আন্দোলন বুর্জোয়াচালিত, এতে স্বাধীনতা আসবে না, যদি আসে ত সে লাল শাসকের তাঁবেদার কালো শাসক।

অমিতাভ সোজা হয়ে উঠে বসলো, ঠোঁটের কোণে দৃঢ়তা ফুটে উঠলো।

তাড়াতাড়ি বললে অমল সোম, আমি কিন্তু এদের সব কথা মানি না অমিতবাবু।

সুখেন্দুবাবু লাল শাসকবৃন্দকে কাল শাসকবৃন্দের চেয়ে বেশী পছন্দ করেন দেখছি। কথার মধ্যে ঝাঁজের একটু আমেজ কিছুতেই এড়াতে পারলো না অমিতাভ।

সুখেন্দু যেন এই অপেক্ষাই করছিল, বিশেষ ভঙ্গীতে চিবিয়ে চিবিয়ে কায়দামাফিক বললে সে, আমরা এমন একটা আন্দোলনের অপেক্ষায় আছি যা ইণ্ডিয়ার ম্যাপের ওপর থেকে ওই দু-রকম শাসকেরই চিহ্ন লোপ করবে। যাকে বলে প্রলিটারিয়েট রেভলিউশন।

ভোজবাজীতে বিশ্বাস আছে দেখছি আপনার। মৃদু হেসে উত্তর দিলে অমিতাভ।

ঠাট্টা করছেন? কিন্তু জানবেন একমাত্র প্রলিটারিয়েট রেভলিউশনই স্বাধীনতা দিতে পারে দেশের জনগণকে।

এইসব দিবাস্বপ্ন নিষ্ক্রিয়তার বর্ম বটে।

তুমি বুঝবে না অমিতাভ। অনুযোগের সুরে বললে সুখেন্দু।

আঃ থামাবে তোমাদের পলিটিকেল জাগলারি! কোণের সোফায় চোখ বুজে বসে থাকা বিমল বোস হঠাৎ চেঁচিয়ে উঠলো।

অমল বোস সুখেন্দুকে ইশারা করে বিমলকে বললে, কবি তুমি নাকি আজকাল চরকার ওপর কবিতা লিখছো?

রট, কে বললে?

কেন, তোমার দাদা, সেই চরকা সঙ্ঘের!

ও ইয়েস মনে পড়েছে। বলেছিল বটে একটা লিখতে।

ললিত। ওয়েটার বেরিয়ে গেল পর্দার বাইরে। পর্দার ফাঁকে ললিতের চোখে পড়লো সামনের কেবিনে বসে দুটি ইংরাজ যুবক যুবতী টেবিলের তলায় পরস্পরের পা নিয়ে খেলা করছে আর উচ্ছল হাসি হাসছে। অকারণে তার মনে আক্রোশ জমা হয়ে উঠলো, চট করে পর্দার ফাঁকটা বন্ধ করে দিলে।

বোতল আর ডিকেণ্টার সাজানো মোগলাই কারুকার্য খচিত ট্রে নামিয়ে দিলে ওয়েটার ললিতের সামনে। হতভম্ব ললিত তার মুখের দিকে চাইতেই সে বললে, আচ্ছা চিজ বাবুজী, দেখিয়ে না!

পেছনে পেছনে আর একজন ওয়েটার খাবারের ডিস্, সসেজ, সরু ভিনিগারের শিশি ইত্যাদি নামিয়ে দিয়ে চলে গেল। কোন কথা বলার ফুরসৎ হবার আগেই তারা দৃষ্টির আড়ালে অদৃশ্য হলো।

অন্তর্দ্বন্দ্বের মধ্যে ছোট হুইস্কির বোতলটার দিকে চেয়ে ভাবলে ললিত, মন্দ কি? দেখি না! শুনেছি কিছুক্ষণের জন্যে আনন্দ পাওয়া যায়! হাতটা তার এগিয়ে গেল বোতলের গলায়।

শঙ্কাজড়িত হাতে খানিকটা ঢেলে চুমুক দিলে। সমস্ত শরীরটা গুলিয়ে গলা থেকে পেট পর্যন্ত জ্বলে উঠলো। দারুণ অস্বস্তিতে কতকগুলো শশাকুচি তুলে চিবোতে লাগলো। স্কচ অমৃতের ক্রিয়া শুরু হতেই মনটা ফরসা হয়ে গেল। পকেটের নোটগুলো নাড়াচাড়া করতে করতে ভাবলে ললিত, যাক্, কিছুদিনের জন্যে কপোতবৃত্তি ঘুচলো! এ কদিন ছবি আঁকার তাগিদ থাকবে না ভেবে তার মন খুশিতে ভরে উঠলো। আঃ বেশ লাগছে, খাওয়া যাক্!

ডিকেণ্টারের তলানিটা শেষ করে ললিত খাবারগুলো শেষ করলে। মাথার মধ্যে একটা ঘোলাটে অনুভূতি; চেয়ারের পেছনে মাথা হেলিয়ে চোখ বুজলো সে।

ওয়েটার এসে ডাকলে, বাবুজী।

জড়ানো গলায় উত্তর দিলে ললিত, বিল্ লেয়াও!

জানো যদি তবে জিগেস করা কেন ?

ছলছল করে উঠলো মৃন্ময়ী দেবীর চোখ, অমিতাভ সান্ত্বনা দিয়ে বললে, তুমি কিছু ভেবো না, আমার কিছু হবে না !

আমার বড় ভয় করছে মিনটু, এবারে হয়তো জানতেই পারবো না।

না না ভেবো না—বলতে বলতে পাশ কাটিয়ে নেমে গেল অমিতাভ সিঁড়ি দিয়ে।

কর্তাদের অংশের সামনে অমিয়কান্তিকে ডাকতেই শিবকালীবাবু বেরিয়ে এলেন ; অমিতাভ বললে, একটা কথা ছিল জ্যাঠামশাই।

এখানেই বলবে না ভেতরে যাবে ?

ভেতরেই চলুন।

মিত্তিরবাড়ির বৈঠকখানায় রামকালীবাবুর অনুপস্থিতিতে সে আস্বস্ত হলো। শিবকালীবাবুর খুব কাছে বসে বললে, আন্দোলন আবার আরম্ভ হয়েছে, আপনি কি করবেন ঠিক করেছেন ?

কথাটা শুনে যেন একটু চঞ্চল হয়ে উঠলেন তিনি।

আপনি মেদিনীপুরে ফিরবেন না ?

একটু ইতস্তত করে প্রায় মনে মনে বললেন শিবকালীবাবু, দেখ অমিতাভ এবারে এখনও কিছু ঠিক করতে পারি নি।

কেন কংগ্রেস তো নির্দেশ দিয়েছে !

সে তো জানি কিন্তু.....

ঘরে এসে ঢুকলো অমিয়কান্তি। আলোচনা বন্ধ করে অমিতাভ বললে, আমি এখন আসি জ্যাঠামশায়, পরে দেখা করবো।

এসো।

অমিয়কান্তিকে নিয়ে অমিতাভ সুরেন সিংহর দরজায় ঢুকে পড়লো হাঁকতে হাঁকতে, সুরেনদা আছো নাকি ?

সুরেন একটা পুস্তিকার মত কি যেন পড়ছিল, সেটা মুড়ে রেখে বললে, এসো এসো মিনটু।

আমাদের কেউ কেউ যোগ দেবে তোমাদের সঙ্গে !

তুমি ? তোমার শ্রমিক সঙ্ঘ ?

আমার পথ শ্রমিক সঙ্ঘের সঙ্গে বাঁধা ভাই। তোমরা খবর রাখো না, পুলিশের নজর আমাদের ওপরও কিছু কম নেই ; আমাদের শ্রেণী আন্দোলনকে দুর্বল করে দেবার জন্যে, সরকার গত কবছরে বহু ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সঙ্ঘকে বে-আইনী ঘোষণা করেছে, নেতাদের রাজবন্দী করেছে,—ষড়যন্ত্রের মামলায় জড়িয়ে জেল দিয়েছে। আমাদের ট্রেড ইউনিয়ন বাঁচিয়ে রাখাই এখন মস্ত সমস্যা হয়ে দাঁড়িয়েছে। তবু তুমি জেনে রাখো, আমরা প্রস্তুত হলেই তোমাদের পাশে গিয়ে দাঁড়াবো।

কথাগুলো বলে ক্লান্তভাবে সুরেন চাইল তাদের দিকে। অমিতাভ বললে দমে গিয়ে, তোমাদের সম্বন্ধে আমি ভাল জানি না, তবে আমার অনুরোধ, তোমরা এগিয়ে এসো এই আন্দোলনে, তোমাদেরও মঙ্গল হবে।

প্রাণপণে সেই চেষ্টাই করছি আমরা শ্রমিক সংগঠনের মধ্যে দিয়ে।

অমিয়কান্তি বিরক্তভাবে বললে, চল্ মিনটু এখানে কতক্ষণ কাটাবি, আমাদের যে যেতে হবে অনেক দূর।

এই যে যাই, উঠে দাঁড়িয়ে বললে, আসি সুরেনদা।

এসো ভাই।

ওরা বেরিয়ে গেল ; বিমনায়মান দৃষ্টিতে সুরেন চেয়ে রইল পথের দিকে।

॥ ৫ ॥

যদিও সামান্য দিনের জন্যে তবু নানা বাধা নানা আত্মবিরোধ ভুলে কিছুদিনের জন্যে বুক ফুলিয়ে দাঁড়ালো বাংলার কৃষক, বাংলার ছাত্র-বাংলার যুবক। ১৯৩২ সালের এই ক্ষীণ সংগ্রামকেও তুচ্ছ করতে পারেনি কর্তৃপক্ষ; তাদের সমস্ত শক্তি নিয়ে, আইন নিয়ে, অভিজ্ঞতা নিয়ে, সহস্র বাহিনী নিয়ে ঝাপিয়ে পড়লো গ্রামে গ্রামে শহরে শহরে। নাগরিক পথিক নিরীহ দেশবাসী তার নিজের অজ্ঞাতে হয়ে উঠলো আইনভঙ্গকারী; নির্বিচারে লাঠির আঘাত এসে পড়লো সযত্নে রক্ষিত মূল্যবান মস্তকে।

কলেজ স্কোয়ারের সামনে এসে অমিয়কান্তি যখন নামলো বাস থেকে তার মনে হলো সে যেন একটা যুদ্ধ ফ্রণ্টের মধ্যে এসে পড়েছে। হ্যারিসন রোডের মোড় থেকে মেডিকেল কলেজ পর্যন্ত সার বেঁধে গুর্খা, পাঠান সৈন্যবাহিনী রাইফেলে সঙ্গীন চাপিয়ে বুঝি আদেশের অপেক্ষা করছে। চারিদিকে সার্জেণ্ট পুলিশ তাদের খেঁটেগুলো হাওয়ায় দুলিয়ে আস্ফালন করে বেড়াচ্ছে।

সে সোজা চলে গেল ইউনিভার্সিটির পাশের গলি দিয়ে। চারিদিকে কলেজের মধ্যে চিৎকার শুনতে পেলে, বন্দেমাতরম্। কাতারে কাতারে ছাত্র এগিয়ে চলেছে বিশ্ববিদ্যালয়ের দিকে, হাতে বইখাতা মুখে দৃঢ় সঙ্কল্প।

গলির মোড়ে অমিয়কান্তির দেখা হয়ে গেল শুভেন্দু নবেন্দু সুখেন্দু আর বিমল বোসের সঙ্গে; আগ্রহের সুরে বললে সে, আপনারা যাচ্ছেন তো সভায়?

না ভাই ও ঝামেলার মধ্যে নেই। হাত নেড়ে বললে বিমল বোস।

॥ ৬ ॥

প্রকাশ্য সংঘর্ষ এড়িয়ে শেষের দিকে কংগ্রেস নতুন নতুন কৌশলে ব্যর্থ করতে লাগলো সরকারের আক্রমণ। একদিকে চললো বুদ্ধির লড়াই, অন্যদিকে চললো আইন অমান্য। ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের সাতচল্লিশ-তম অধিবেশন আহ্বান করলে কংগ্রেস; প্রত্যেক প্রাদেশিক সরকার কঠোরভাবে এই অধিবেশন পণ্ড করার জন্যে কোমর বেঁধে লাগলো। সভাপতি মোহন মালবীয় অধিবেশনে আসার পথে গ্রেপ্তার হলেন আসানসোলে; কলকাতার কংগ্রেসীরা দ্বিগুণ উৎসাহে লেগে গেলেন অধিবেশন অনুষ্ঠানের কাজে গোপনে। রাস্তায় রাস্তায় লাঠিচালনা পুলিশপাহারা তুচ্ছ করে বুকে বসে দাড়ি ছেঁড়ার তোড়জোড় চললো। পুলিশকে কদলী দেখিয়ে শত শত কংগ্রেস প্রতিনিধি এসে জমা হলো নানা প্রদেশ থেকে কলকাতায়।

অমিয়কান্তি বাড়ি থেকে বেরোবার সময় গোপনে রুনুকে বলে গেল, যদি না ফিরি রাত্রি আটটার মধ্যে, বুঝবে গ্রেপ্তার হয়েছি। তখন বাড়িতে বলতে পারো।

নিশিকান্ত চৌধুরীর অংশটার কাছে অমিয়কান্তি দেখতে পেলে নবেন্দু বিনতা তার জন্যে অপেক্ষা করে দাঁড়িয়ে। চোখের একটা ইসারা করে সে এগিয়ে গেল গলির মোড়ে।

বড় রাস্তায় এসে অমিয়কান্তি হেসে বললে, তৈরী হয়ে এসেছো? আজ ফেরার আশা কম।

তা জানি, তোমার চিন্তা নেই। বললে নবেন্দু।

বিনতা হেসে বললে, আমাদের উনি বিশ্বাস করতে পাচ্ছেন না।

না না তা নয়।

যাক্। চলুন তাড়াতাড়ি, এখানে দাঁড়িয়ে থাকা নিরাপদ নয়।

তিনজনে এগোল ট্রামরাস্তার দিকে। নবেন্দু বললে, কিসে যাবেন ? ট্রামে না বাসে।

ট্রামে চাপা উচিত নয়, বাসেই চলুন, বললে বিনতা।

একটা যাত্রীভর্তি কালীঘাটের বাসে তিনজনে উঠে পড়লো।

বাসের মধ্যে দু একজন লোকের সঙ্গে মুখচাওয়াচায়ি হয়ে গেল অমিয়কান্তির। নবেন্দু জিজ্ঞেস করলে, ওরা কে ?

তার কানে কানে অমিয়কান্তি বললে, ওরাও যাচ্ছে, আমাদেরই লোক।

ধর্মতলার মোড়ে তিনজনে নেমে পড়লো ; অমিয়কান্তি বললে, চলো আগে একটু চা খেয়ে নি, এখনও সময় হয়নি।

সামনেই একটা বোম্বাই চায়ের দোকানে তিনজনে গিয়ে বসলো, মুখগুলো ট্রামডিপোর দিকে ঘুরিয়ে।

সবাইয়ের বুকের মধ্যে একটা অদ্ভুত মৃদু কম্পন শুরু হয়েছে ; ওইখানে, কলকাতার বুকের ওপর, ট্রামযাত্রীদের আশ্রয়স্থলে অল্পক্ষণ পরেই একটা ঐতিহাসিক ঘটনা ঘটে যাবে, অথচ, এখনও ওই পাশে বসা পানের দোকারদারটাও সেকথা জানে না। ওই যে পুলিশটা দাঁড়িয়ে সিগারেট টানছে আর আড়চোখে গোঁফে তা দিয়ে নিজেকে জাহির করার আপ্রাণ চেষ্টা করছে, ওই ফিকফিকে হাসিভরা মুখটা এখুনি বন্য হিংসালু হয়ে উঠবে।

কিছু খেয়ে নিন, খাবারের ডিসটা এগিয়ে দিয়ে বললে বিনতা।

অমিয়কান্তি একটা কেক্ তুলে খেতে খেতে চাইল তার দিকে।

চেয়ে আছেন যে ? প্রশ্ন করলে বিনতা।

ভাবছি আপনাকে এইখানেই বসিয়ে রেখে আমরা যাবো।

তা বইকি। আমার তো হাত পা নেই। রেগে বললে বিনতা।

নবেন্দু তুমি কি বলো ?